স্নেহের ঋণ

শ্রীসত্যরঞ্জন রায়, এম্, এ,
প্রণীত।

প্রকাশক
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ও
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

কিংখাবলাঞ্ছিত ধরিত্রী, বায়ুমণ্ডল সঙ্গীতঝঙ্কারে শব্দময়, উন্মাদনাময়। রুগ্নার সম্মুখে যেন তাঁহার প্রিয়তমের মূর্ত্তি সুরলোক হইতে দিব্যজ্যোতিঃ মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইল। সে মূর্ত্তি কহিল, "কেন মরিবে, হেম? জীবন ক্ষণিক, কর্ত্তব্য অনন্ত। অনন্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া এই অনন্তের লোকে তুমিও এক দিন আসিবে। আমি তো তোমা ছাড়া নই।" সেই আশ্বাসবাণী অভাগিনীর শোকভগ্নহৃদয়ের বিশল্যকরণী। হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, তাঁহার প্রাণাধিকপ্রিয় পতি তাঁহারই হৃদয়সরসিজে বিরাজিত, বক্ষঃবাপীতে শশাঙ্কের মত চিরপ্রতিবিম্বিত। স্বামী তাঁহাকে কর্ত্তব্যের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্রতপালনের আদেশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে বাঁচিতে হইবে। তারপর মনে পড়িল স্বামীর মৃত্যুশয্যায় প্রদত্ত অনুজ্ঞা। সেই করাল ব্যাধির সময় যখন মৃত্যুর ছায়া পতির মুখমণ্ডলে পতিত হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম।—অনন্তের যাত্রী সান্ত লইয়া ক'দিন ভুলিয়া থাকিতে পারে?—কেবল তোমার জন্য দুঃখ হয়। এই নবীন যৌবনে তোমায় যোগিনী সাজিতে হইল। সকলি বিধাতার ইচ্ছা। আমা হইতে এই বংশ লোপ পাইবে ইহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়। কার্ত্তিক বাবুর মধ্যম ছেলেটি বড় ভাল। তাহাকে আমার মৃত্যুর দুই বৎসর পর দত্তক লইবে।"

কর্ত্তব্যের আহ্বানে সঞ্জীবিতা রোগিনী শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন।

২

সুস্থা হইয়া হেমাঙ্গিনী গৃহকার্য্যে মন দিলেন, দেবদ্বিজারাধনায়

তৎপর হইলেন। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, কেশ মুণ্ডিত, অঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের দিব্যজ্যোতিঃ। প্রেমোন্মাদিনী এখন পূর্ণ ব্রহ্মচারিণী দয়াময়ী গৃহিণী। তাঁহার গৃহ বার মাস পূজাপার্ব্বণে, সৎব্রাহ্মণ ও অতিথির সমাদরে মুখরিত। চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়াদিতে নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও রবাহুত সকলে পরিতুষ্ট। কিন্তু গৃহকর্ত্রী স্বয়ং স্বল্পাহারী। ঠাকুরসেবায় ও জপ পূজায়ই অধিক সময় অতিবাহিত করেন। ব্রাহ্মণভোজন ও অতিথি সৎকার না হইলে জল গ্রহণ করেন না। যাহার বাড়ীতে একবেলা অন্ন জোটে হেমাঙ্গিনী তাহার দুইবেলা অন্নসংস্থান করিয়া দিলেন, যাহার ছেলে বুদ্ধিমান্ অথচ অর্থাভাবে পাঠাভ্যাস করিতে পারে না, তিনি তাহাকে বাসায় রাখিয়া পড়াইতে লাগিলেন, দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে যাহারা চাকরির উমেদারি করিতে আসিত তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন, কন্যাদায়ে বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থে ও অন্ধ আতুর রোগক্লিষ্টের উপকারার্থে কোষ মুক্ত করিলেন। নাম কিনিবার প্রবৃত্তি নাই। পরন্তু অনেক সময় তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কার্য্য বাম হস্তও জানিত না। ঠাকুরাণীরা তীর্থপর্য্যটনের কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, "আমার সকল তীর্থ তাঁহার বাস্তুবাটী, এই মহাপীঠে নিত্য বাস করিতেছি। ইহা ছাড়িয়া যাইব কোথায়?"

এইরূপে দান ধর্ম্মে আতিথেয়তায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

৩

আজ পতিবিয়োগের ঠিক্ দুই বৎসর পর হেমাঙ্গিনী কার্ত্তিক বাবুর পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে আনন্দ কত! এক দিকে পত্যাদেশপালনজনিত চিত্তের প্রসন্নতা, অন্যদিকে মাতৃত্বের

অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখ! হউক্ পোষ্যপুত্র, মা বলিয়া ডাকে তো! ভিখারীর কাতরকণ্ঠনিঃসৃত মাতৃসম্বোধনে বন্ধ্যার মনে স্নেহের উৎস উৎসারিত হয়। এ তো বালকের হাসিকান্নামাখা আবদারের 'মা' ডাক! হেমাঙ্গিনীর হৃদয় গলিবে না? বালকটিও তরল হাস্যের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি, লীলাচঞ্চল তাহার গতিবিভ্রম। অকালে পোষ্যপুত্র গণেশচন্দ্র হেমাঙ্গিনীর সংসারে ও হৃদয়ে অসীম আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। তাহাকে পতির যোগ্য পুত্রে পরিণত করিতে অভাগিনী যথোচিত প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

স্নেহের অমৃতরসে পুষ্ট বালক দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে লাগিল। তাহার ক্রীড়াকৌতুক ও বালসুলভ চাপল্য দৃষ্টে বিরহবিধুরা ভাবিতেন, "আহা, তিনি যদি এ সব দেখিতেন!" হেমাঙ্গিনী পরের ছেলেকে যেমন আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এমন বুঝি কেহ পারে না।

যাহা হউক, যত্নের আতিশয্যে গরীব গণেশের রুক্ষ কেশ মসৃণ ও পাংশুচর্ম্ম রক্তিমাভ হইল। লোকে তাহার প্রকাণ্ড মাথা দেখিয়া প্রথমে যে একটা 'জিনিয়াসের' পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহা শীঘ্রই পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল ও এইরূপ নূতন সিদ্ধান্ত করিল যে, মস্তক বড় হইলেই মস্তিষ্ক বাড়ে না, পরন্তু উহা কেবল গোময়পূর্ণ বলিয়াও বৃহৎ দেখাইতে পারে। তাই অনেকেই তাহাকে এখন হইতে কেবল গণেশ না বলিয়া 'গোবরগণেশ' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শ্রীমানের মস্তিষ্ক নিতান্ত উষর দেখিয়া ভাল ভাল শিক্ষকও ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িলেন। পুত্রের শিক্ষার অপূর্ণতায় হেমাঙ্গিনী দুঃখিতা হইলেন, কিন্তু উপায় ছিল না। বিদ্যাশিক্ষার জন্য উপযুক্ত 'প্রাইভেট টিউটর' নিয়োগই যথেষ্ট নহে।

মাথায় কিছু থাকিলে তো তাহার বিকাশ হইবে? হেমাঙ্গিনীর যত্নের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু মানুষের যত্ন সকল সময় সফল হয় না। পোষ্য-পুত্রের দ্বারা পতির নাম ও বংশ থাকিবে কি ডুবিবে তাহা এখনও তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল।

৪

গণেশের মত নির্বোধ অথচ ধনবান্ ছেলের 'উপযুক্ত' সঙ্গীলাভে কালবিলম্ব হয় না। ক্রমে তাহার টেরি, ছড়ি ও সিগারেটের বাহারের সঙ্গে সঙ্গে ঢের মো-সাহেব জুটিয়া গেল। গণেশ যাহা কিছু বলে, যাহা কিছু করে তাহাতেই তাহারা 'তারিফ' ও 'বাহবা' দিতে লাগিল। গণেশের কথা ছাড়, প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি অজস্র বর্ষিত হইলে সংসারে কজনার মাথা ঠিক্ থাকে? বলা বাহুল্য, শীঘ্রই হেমাঙ্গিনীর সাধের পুত্রের মাথা বিগড়াইয়া গেল ও সে এখন হইতে আপনাকে একটা 'কেষ্টবিষ্টু' মনে করিতে লাগিল। সে ইহাও বুঝিল, আর কিছুদিন পর বিধবা হেমাঙ্গিনীর সকল সম্পত্তির একমাত্র মালিক সে-ই।

ইতিমধ্যে গণেশের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল ও সে ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিয়া সপ্তদশে উপনীত হইল। এখন হইতে সে বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীরভাবে সম্পত্তিসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে নিজের অভ্রান্ত মত প্রকাশ করিতে লাগিল ও স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে আমোদপ্রমোদের সহচরবৃন্দের পোষকতার অভাব ছিল না। পুস্তকের শুষ্ক রসের স্থলে অল্প স্বল্প নৃত্য গীতে ও সিদ্ধি-সুরার তরলরসে গণেশের মন মাতোয়ারা হইয়া গেল। এমন পুত্র সাবালক না হইলে প্রয়োজন

বিশেষে টাকা চাহিয়া লয় বা বাক্স ভাঙ্গিয়া লয়। গণেশ উভয়রূপেই তাহার বর্ত্তমান অভাবগুলি মিটাইতে লাগিল। আগাছার মত তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিগুলি হেমাঙ্গিনী কিছুতেই কাটিয়া ছাঁটিয়া সঙ্কুচিত করিতে পারিলেন না। অভাগিনীর নীরবে রোদন ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

পাছে গণেশ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ফিরিবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া পড়ে, এইরূপ নানা চিন্তার পর হেমাঙ্গিনী পরমা সুন্দরী একটি বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। বিশেষতঃ, পুত্রবধূ ঘরে আনিয়া সুখের আশা কে না করে? গণেশকে হেমাঙ্গিনী নিজের গর্ভেই কেবল ধরেন নাই, আর সর্ব্বপ্রকারে তিনি তাহার গর্ভধারিণী জননী হইতে কোন অংশে পৃথক ছিলেন না। সেই পরম যত্নে পালিত পুত্রের নববধূ যে কত আদরের, কত সাধের তাহা পুরুষের পক্ষে বুঝা কঠিন। হেমাঙ্গিনী বড় আশা করিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিলেন। প্রাণাধিক প্রিয় যিনি তিনি ছাড়িয়া গিয়াছেন। সাধের পুত্রও বিগড়াইয়া গেল। এখন এই ক'নে বৌকে লইয়া যদি কতকটা আনন্দে দিন কাটে এই আশায় অভাগিনী শুভদিনে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা রোধ করিলেন। তবু মনের ভিতর হইতে কে যেন বারংবার ঘা দিয়া কহিল, "এই রূপসীকে তিনি দেখিলেন না!"

৫

গণেশ সাবালক হইয়া বিষয় সম্পত্তি নিজেই দেখিতে লাগিল।

শোণপুর হইতে ঘোড়া ও 'ডাইক্সে'র বাড়ী হইতে গাড়ী আসিল। তখন বাঙ্গালায় মোটর আসে নাই। নহিলে একটা 'ফোর্ডকার্' বা

'ল্যাণ্ডোলেট্ কার'ও অবশ্য আসিত। গণেশের জুড়ি দেখিয়া তাহার বন্ধুরা বলিত, এমন জুড়ি গাড়ী সে অঞ্চলে কাহারো নাই। তাহা শুনিয়া গণেশ মৃদু মৃদু হাসিত। সে একেবারে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ!

ক্রমে মজুত যাহা ছিল দেখিতে দেখিতে তাহা যাইতে বসিল। দুই বৎসর পর যখন তাহার একটি পুত্র জন্মিল তখন সে ধার করিয়া খুব ধুমধামে বাই খেমটা সহ তাহার অন্নপ্রাশন দিল।

এখন হইতে হেমাঙ্গিনীর কাজ ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। শিশুটিকে লইয়া তাঁহার দিবারাত্রি ব্যস্ততা কত। আসল হইতে সুদের মায়া কম হয় না। পরের ছেলে মানুষ করিতেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

ব্রহ্মার বরে বধূ প্রভাবতীর দেড় বৎসর পর একটি কন্যা জন্মিল। তাহার পিঠে আর একটি খোকা আসিল। ইহার পর পর দুইটি ছেলে আঁতুড়ে মারা গেল। অকালসঞ্জাত উর্ব্বরতা ও ঘন ঘন প্রসব সূতিকার প্রধান কারণ। সেই সূতিকা রোগে বধূর অঙ্গযষ্টি কেবল যষ্টিমাত্রে পরিণত হইল। লাবণ্য গেল, সৌন্দর্য্য গেল। রহিল শুধু চর্ম্মের প্রভাহীন গৌর বর্ণটুকু, বাড়িল প্রকৃতির উষ্ণাধিক্য। হেমাঙ্গিনীর অবসর মাত্র নাই। ঘর সংসারের কাজ, বধূর সেবা শুশ্রূষা ও ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া তাঁহার তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম নাই। ইহা ছাড়া, গর্ভধারিণী প্রভা, মাতার ষোল আনা ঝঞ্ঝাট ঠাকুরমার।

আমরা এ পর্য্যন্ত প্রভার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। নবকিশোরীর অবগুণ্ঠনাবৃত লজ্জানত মুখচ্ছবিতে লোকে কেবল মাধুরীই দেখিতে পায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরালে যে সব প্রকৃতিগত ভাব প্রকট হইয়া পড়ে তাহার অস্তিত্বের অনুমান প্রথমে করা বড় কঠিন।

বধূর আপাতবশ্যতার স্থলে ধীরে ধীরে যে স্বাতন্ত্র্যটুকু ফুটিয়া উঠে তাহাতে অনেক সংসারে বহু খণ্ডপ্রলয়ের সৃষ্টি হয়। প্রভাবতী শাশুড়ীকে প্রথম প্রথম মুখ ফুটিয়া দুই এক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সংযমের রাশ ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে যেমন কলহে নিপুণা তেমনি ফরিয়াদী হইতেও পটু। বিশেষ গণেশ মাতাকে উপেক্ষা করে, কিন্তু তাহাকে ভালবাসে। অধিকন্তু কয়েকটি সন্তান উপঢৌকন দিবার পর হইতে প্রভাবতী স্বামীর উপর আধিপত্য পাকা করিয়া লইয়াছিল। সেই জোরে সে শাশুড়ীকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়া তাঁহার মর্ম্মব্যথা জন্মাইতে দ্বিধা বোধ করিত না। গণেশ পাঁচ ইয়ারে ব্যস্ত, অন্দরমহলের 'পলিটিক্সে' নজর দিবার তাহার প্রবৃত্তি বা অবসর ছিল না। সে মাতা-পত্নীর বিরোধে স্ত্রীর দাসানুদাসের ন্যায় মাতাকেই ভর্ৎসনা করিত। প্রভাবতীর আনন্দ দেখে কে? এখন হইতে সংসারে তাহারই পূরাপূরি জিত্, হার হেমাঙ্গিনীর।

স্বামীর বদ্‌চাল দেখিয়া প্রভা পূর্ব্ব হইতেই একটা স্বতন্ত্র তহবিল রাখিতেছিল। কিন্তু বাহিরে কর্ত্তা পতি, ভিতরে কর্ত্রী শাশুড়ী। তহবিলের তেমন পুষ্টিবিধান হইতেছিল না। তাই স্বামীকে সদুপদেশ দিয়া সে অন্দরের সর্ব্বময়কর্ত্রী হইবার অনুজ্ঞা আদায় করিয়া লইল। শাশুড়ী খোকাখুকীদের লইয়া ব্যস্ত, লোকজন খাওয়াইতে ব্যাপৃত, পূজাহ্নিকে রত। হিসাবপত্র দেখিবেন কখন? বিশেষ তিনি দান ধ্যানে খরচ করেন বেশী, অতএব তাঁহার কৃত এইরূপ অপব্যয়ের পথ রুদ্ধ করিতে সিন্দুকের চাবি প্রভাবতীর হাতেই থাকা উচিত। আর এখন শাশুড়ীর সংসার নয়, গণেশ ও প্রভাবতীর সংসার।

তাহাদের স্বার্থ তাহারা যেরূপ দেখিবে প্রতিপালিকা মাতার পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর নয়। আর প্রভাবতীও তো এক কর্ত্রী। মা এতদিন গিন্নীপণা করিলেন, সে পাঁচ সন্তানের মা হইয়া এখন কর্ত্তৃত্ব না করিবে কেন? এতগুলি যুক্তির বিচার বিশ্লেষণের মাথা গণেশের ছিল না। সে সোজাসুজি এই প্রস্তাব মার নিকট পেশ করিয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মা তখনই রাজি। বলিলেন, "বেশ তো বাবা, বৌমার ঘর সংসার বৌমা বুঝিয়া লইবেন, ইহা হইতে সুখের বিষয় আর কি আছে?"

নির্ব্বিঘ্নে কাজ হাঁসিল হইয়া গেল দেখিয়া প্রভা খুব খুসী হইল। তাহার তহবিল বাড়িতে লাগিল।

গণেশ স্ত্রীর হাতে সংসারভার দিয়া আরও বে-পরওয়া হইয়া গেল। মার কাছে অনেকদিন হইতেই গরহাজিরের বা রাত্রিশেষে হাজিরের কৈফিয়ৎ দিতে হইত না। প্রভাই তাহার ঐ সব কার্য্যের প্রধান বিরোধী ছিল। এমতাবস্থায় তাহাকে কোনরূপে তুষ্ট করা গণেশের অভিপ্রেত হওয়া অসম্ভব নয়। এখন গৃহকর্ত্রী হইয়া প্রভার দৃষ্টি শতমুখী হইল। সে এখন হইতে মনকে বুঝাইতে লাগিল, স্ফূর্ত্তি করা বড় লোকের পোষাকি সখ। উনি উঁহার জীবনের কার্য্য লইয়া থাকুন, আমি আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া লই।"

৬

কর্ত্রী হইলে কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়। কাজেই প্রভা সকলের উপর যেমন, তেমনি হেমাঙ্গিনীর উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। অভাগিনী তাহাও বসুন্ধরার ন্যায় সহিতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে বৌকর্ত্রী হেমাঙ্গিনীর অনেক সদ্ব্যয় বন্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ভোজন উঠিয়া গেল, পূজা পার্ব্বণের

ব্যয় কমিয়া গেল, ছাত্র উমেদার প্রতিপালনের ঝঞ্ঝাট মিটিয়া গেল, অতিথিসেবা কালে ভদ্রে দাঁড়াইল। পৌত্রপৌত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া হেমাঙ্গিনী সব সহিলেন। কিন্তু প্রভার প্রখর বাক্যবাণ আর সহা যায় না। একদিন বৌ কহিতেছিল, "মা, আপনার দোষেই এদের এতদূর বাড়াবাড়ি হয়েছে। আপনার প্রশ্রয়েই সংসারটা মাটি হল।"

হেমাঙ্গিনী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "বৌমা সবই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

হতভাগিনী নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

প্রভা চীৎকার করিয়া বলিল, "এই দুপুর বেলা চোখের জল ফেলিয়া আমার বাছাদের অকল্যাণ করিবেন না।"

চক্ষু মুছিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "বাছারা দীর্ঘজীবী হোক্।" দুঃখিনী তাঁহার মনকে পাষাণের মত দৃঢ় করিতে যত্নবতী হইলেন।

ইহার পর প্রভা তাহার পিত্রালয় হইতে আনীতা ক্ষেমী দাসীর নিকট শাশুড়ীর নিন্দা করিতে বসিয়া গেল। শাশুড়ীর নিন্দা প্রায় সকল বধূরই বিশেষ মুখরোচক। প্রভার ততোধিক।

হেমাঙ্গিনী মনের দুঃখ কাহাকেও বলিতেন না, গণেশকেও না। কিন্তু প্রভার 'রিপোর্টে'র বিরাম ছিল না। তবে পতির নিকট শাশুড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানি আরম্ভ হইতে না হইতে মুলতুবি পড়িত। কারণ, প্রভা দক্ষ কৌন্সুলির মত যখন মামলা বেশ সঙ্গীন করিয়া তুলিত বিচারক তখনই গুরুতর নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিত। ক্রমাগত মুলতুবি দেখিয়া বাদিনী চটিয়া লাল। কিন্তু বেচারা গণেশের কোন দোষ ছিল না। সে আপনাকে লইয়াই নিয়ত ব্যস্ত, কোন মতে বাড়ীতে যে উপস্থিত হয় ইহাই যথেষ্ট।

একদিন ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইল।

গণেশ ষ্টেটের নগদ টাকাকড়ি যাহা কিছু পাইয়াছিল তাহা সুরা, নর্ত্তকী ও মো-সাহেবের প্রসাদাৎ কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছিল। টাকার প্রয়োজন যথেষ্ট, অথচ হাতে টাকা নাই, এ অবস্থায় দেনা ব্যতীত উপায় থাকে না। অন্য কোন বিদ্যা না থাকিলেও 'হ্যাণ্ডনোট' লিখিতে গণেশ সরস্বতীর বরপুত্র। তারপর লোকে কেবল হ্যাণ্ডনোটে আর টাকা দেয় না। গণেশ তখন ছোট ছোট সম্পত্তি বন্ধক দিয়া কর্জ্জ করিতে লাগিল। সরিকেরা এই আত্মহত্যায় ইন্ধন যোগাইতে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। কেননা, তাঁহারা নিকট আত্মীয়। রক্তের সম্বন্ধ যত নিকট পূর্ণগ্রাসের চেষ্টাও তত বলবতী হয়।

ইতিমধ্যে, গণেশের জনকতক 'বন্ধু' তাহাকে কলিকাতায় একটা থিয়েটার খুলিতে সদুপদেশ দিল। উহাতে রি রি করিবে গা, ঝিম্ ঝিম্ করিবে মাথা,—হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার,—মজার মজা, লাভের লাভ। কলিকাতার মিস্ কুঙ্কুমের 'অপেরা কোম্পানীর' একজন 'ডিস্‌মিস্‌ড' কর্ম্মচারী তাহাতে 'সুগ্রীব সহায়' হইলেন। তাঁহার বেশ মোটা সোটা নাদুস্ নুদুস্ চেহারা। বাড়ী কলিকাতায়। বাবুটি থিয়েটারের মাহাত্ম্য অতিরঞ্জিত চিত্রে শীঘ্রই গণেশের মানসপটে অঙ্কিত করিলেন। মক্ষিকা জালে পড়িল। একদিন গণেশ তাহার 'নিউ থিয়েটার' খুলিবার সঙ্কল্প করিয়া মার সহিত স্বাক্ষাৎ করিতে যাই অন্দর মহলে আসিতেছিল, অমনি তাহার বীরাঙ্গনার কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব ব্যঙ্গরসাত্মক বক্তৃতা তাহার কর্ণগোচর হইল।

প্রভা কহিতেছিল, "লোকে বুঝে না পাওনাদারদের তাগিদ মত

টাকা দেওয়ার সুখ কত। তারা কেবল খেয়ে শুয়েই খালাস। টাকা আসে কোত্থেকে তা ভেবে দেখে কে? আত্মীয়তার মুখোষ পরে অনেকেই, কিন্তু দুপয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করে কে? এই পরশুদিন যে টাকার শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল, তা'তে লোকসান হ'ল কার?"

যাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইতেছিল তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে প্রভা তাঁহারই দুর্ব্বল স্থানে ঘা দিতেছে। তিনি সব সহিতে প্রস্তুত, কিন্তু স্বামীর আত্মার কল্যাণার্থে প্রতি বৎসর যে সম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করেন, তাহার ব্যয় কমাইতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। হেমাঙ্গিনীর সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি স্পষ্ট বলিলেন, "বৌমা, এ বিষয়ে আমি কাউকে বাধা দিতে দিব না। তোমার সকল অত্যাচার সইতে পারি, এ অত্যাচার সইব না। বছর বছর তাঁর যে কাজ করি তার জন্য তোমাদের কিছু দিতে হবে না।"

প্রভা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি, অত্যাচার করি আমি? আমি আপনার সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তরায়, বিঘ্ন, কণ্টক?—আসুন তিনি, শূন্য ভাণ্ডারের চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে যাব—"

এমন সময়ে গণেশ সহসা বাটীর ভিতরে পঁহুছিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? ছিছি, মার সঙ্গে এ সব কি হচ্ছে? মা, হয়েছে কি?"

আজ বহুদিনের পর সন্তানের নিকট আশাতীত মিষ্ট ব্যবহার পাইয়া হেমাঙ্গিনীর আনন্দাশ্রু দেখা দিল। তাঁহার স্নেহের উৎস খুলিয়া গেল। গণেশের সৌভাগ্য তাহার এমন সময়ে প্রবেশ ও এরূপ উক্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফলদায়ক হইয়াছিল।

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া হেমাঙ্গিনী কহিলেন, "কিছু নয়। এ সময়ে কি মনে ক'রে এসেছিস বাবা?" উপযুক্ত মুহূর্ত্তে গণেশ আসল কথা উত্থাপন করিল।"

হেমাঙ্গিনী অতিশয় আদরে তাহার সম্মুখে জলখাবার দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। প্রভা নেপথ্যে ক্ষেমীকে কহিল, "মাগীর রকম খানা ছ্যাখ্।" বৌ আসিয়া অবধি পুত্রের অনেক ভার হেমাঙ্গিনীর স্কন্ধচ্যুত হইয়াছিল। আজ সেই বড় খোকাটিকে নিজে খাইতে দিয়া তাঁহার আনন্দ কত। গণেশের কিন্তু আহারে একেবারেই মন ছিল না। না খাইলে নয়, তাই খাইতেছিল। অবশেষে সে আসল কথা পাড়িল,—"মা, টাকার অভাব আর মিট্‌ছে না। তাই রোজগারের একটা পথ খুল্‌ব ভেবেছি। হিসাব করে দেখেছি, কলিকাতায় একটা থিয়েটার খুলিলে যে লাভ হয় তার কাছে মাসে শতকরা তিন টাকা শুদ বা চার সেয়ারও কিছু নয়। এজন্য যে অর্থ আবশ্যক তার বারো আনা আমি জমিদারী রেহান দিয়ে সংগ্রহ কর্‌ব। আপনি আর চারি আনা দিবেন। সপ্তাহে তিন দিন 'প্লে' দেখিয়ে এক বছরেই মূলধন শোধ করে ফেল্‌ব। তার পর জমিদারিও খালাস হবে, আপনার টাকাও শোধ হ'য়ে যাবে। প্রথম বছরের পর হ'তেই আমার খাঁটি লাভ, মাসিক পাঁচ হাজার টাকা। বড় তুচ্ছ নয় এ আয়, বাড়া ভিন্ন এর কমি নাই।"

গণেশ গুপ্তচর মুখে জানিতে পারিয়াছিল তাহার মাতার কাছে কতকগুলি আকবরি ও কোম্পানির মোহর আছে, উহার মূল্য অন্যূন বার তের হাজার টাকা। গণেশচন্দ্রের সহসা প্রকটিত মাতৃভক্তির মূলে ঐ মোহরগুলি।

যাহা হউক, থিয়েটার খোলা উচিত কিনা সে বিষয়ে হেমাঙ্গিনী সহসা ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি গণেশের প্রদর্শিত হিসাবে সন্দিহান হইলে সে বড় তরফের কাকা বাবুকে ডাকাইল। কারণ তাঁহার বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং হেমাঙ্গিনীও জমিদারির জটিল বিষয়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। কাকা বাবু থিয়েটার খোলার প্রস্তাব পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। গণেশের প্রায় সমুদায় লাভবান্ সম্পত্তি রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা ধার দিয়া তাহার জমিদারি গ্রাস করিবার এই মাহেন্দ্র সুযোগ তিনি ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। অতএব, আহূত হইয়া তিনি তাঁহার চিরসঙ্গী একটি কুক্কুর ও একটি স্তাবককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং আত্মীয়তার অনুরোধে এইরূপ সৎপরামর্শ দিলেন যে, দেশে যত প্রকার আয়ের পথ আছে তন্মধ্যে থিয়েটার হইতেই লাভ হয় বেশী। কিন্তু গণেশের মাথায় যে এত বড় একটা অর্থনীতির নূতন আবিষ্কার সহসা প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই; আর, যখন কলিকাতার থিয়েটারের একজন সুদক্ষ ম্যানেজার সকল বন্দোবস্তের ভারগ্রহণে সম্মত আছেন তখন গণেশের মা ঈদৃশ প্রস্তাবে নিশ্চিন্তমনে সম্মতি দিতে পারেন। বৃদ্ধ চাটুকার ভ্রুকুটি করিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে পান চিবাইতেছিল। সে প্রভুর কথা শেষ হইতে না হইতে "কর্ত্তা ঠিক বলেছেন, কর্ত্তা ঠিক বলেছেন" বলিয়া উঠিল, কুক্কুরটাও হাই তুলিয়া 'কেঁও' করিয়া তাহাতে সায় দিল।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর হেমাঙ্গিনী মোহরভরা বাক্স গণেশের সম্মুখে রাখিলেন। সে সবিস্ময়ে দেখিল, অনুমিত ধন হইতে মোহরের মূল্য অনেক অধিক। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "লও বাবা, এই মোহরগুলি।

ইহার দ্বারা যদি তোমার আয়ের পথ সুগম হয় তবে ইহা তোমারই প্রাপ্য।”

প্রফুল্লতার আধিক্যে গণেশ কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিল না। শুনিয়াছি, রংএর্ গোলাম সেই রাত্রেই প্রভাবতীর অপরিসীম বিস্ময় দূর করিয়া তাহার রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিল এবং উপযুক্ত বৌমা শাশুড়ীকে হৃতসর্ব্বস্বা হইতে দেখিয়া পরম পুলকিতা হইয়াছিল।

পরদিনই কূপমণ্ডুক গোবর গণেশ আজব সহর কলিকাতায় রওনা হইল। মুক্ত বিহঙ্গ ভারতের প্রধান নগরীর দিগন্তব্যাপী আকাশতলে উধাও হইয়া উড়িল। বলা বাহুল্য যোগ্য ম্যানেজার মফঃস্বলবাসী দীর্ঘকর্ণের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন।

৮

গণেশ কলিকাতায় গিয়া ‘নিউ থিয়েটার’ খুলিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার সাধের থিয়েটার এক বৎসর যাইতে না যাইতে লোপ পাইল। যোগ্য ম্যানেজারটিও বাবুর ব্যবসায় ফেল্ পড়ার পর অদৃশ্য হইলেন। কলিকাতা বিস্মৃতির অতলগর্ভ। কত কীর্ত্তি তাহার অভ্যন্তরে ডুবিয়া যায় তাহার সংখ্যা নাই। গণেশের কীর্ত্তিও যে উহাতে লোপ পাইবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি? দুই একখানি সাপ্তাহিক পত্রে তাহার ‘কার্টুন’ বাহির হইল। নূতন বন্ধুদের কেহ কেহ এই বৃহৎ অজের বলিদানে করতালি দিবার লোভ সম্বরণ করিল না।

থিয়েটার উঠিয়া গেলেও গণেশ অভিনেত্রীদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। বিরাট অসাফল্যের পর সহসা দেশবাসী-দিগের নিকট মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধও করিল। কিন্তু কলিকাতায়

থাকিতে হইলে যে অর্থ আবশ্যক তাহা ছিল না বলিয়া গণেশকে অগত্যা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

এদিকে হেমাঙ্গিনীর উপর প্রভাবতীর অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিয়া দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন গণেশ বাড়ী আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল। প্রভা স্বামীকে বুঝাইল, "তোমার মা টাকায় দুঃখ ভুল্‌তে পারচেন না। তাই যখন তখন যা' খুসী তা' আমাকে শুনাইয়া দেন। তোমাকে ভয়ে কিছু বল্‌তে সাহস পান না। কিন্তু যত কথা শুন্‌তে হয় আমাকে।" ইহার পর একদিন গণেশ কথায় কথায় হেমাঙ্গিনীকে শুনাইয়া দিল, "তুমি টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনেছ মনে করিও না। যে ছেলে বেচে বা কেনে সে মা নয়। তোমাকে মুখে মা ব'লে স্বীকার করি এই যথেষ্ট। অন্য কেহ হইলে আমি একদিনও এ সব সহ্য করিতাম না। তোমাকে কিছু বলি না ভেবে বরাবর তোমায় মাফ করিব ভেব না। আর কোন দিন কারো সঙ্গে ঝগড়া করিলে ভাল হবে না।" ইহা শুনিয়া হেনাঙ্গিনী কাঁদিলেন না, বজ্রাহত হইলেন।

গণেশ সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়া এখন হইতে মদ্যপানের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দলিল কবুলিয়ত জাল করিয়া দৈন্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অদৃষ্টের উপহাস তাঁহার এমনি মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। দুঃখ দুশ্চিন্তায় অভাগিনীর হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হইল।

৯

পতির পুণ্যপীঠ ছাড়িয়া যাইতে হেমাঙ্গিনীর বুক ফাটিয়া গেলেও

তিনি কিছুদিনের জন্য কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন। প্রভাবতীর কৃত নিত্য ভৎ‍‍র্সনা ও গণেশের নিষ্করুণ ব্যবহার হইতে দিন কয়েকের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিতে তাঁহার বাসনা হইল। তিনি পুত্রকে মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে গণেশ মিষ্ট বচনের শীতল বারিবর্ষণে অভাগিনীর তপ্তহৃদয় সিক্ত না করিয়া ইয়ারের ইতরভাষায় বলিয়া উঠিল, "রক্ষা করিলে বাবা! দু'দিন যা'হোক্ শান্তিতে থাক্‌ব।" আজ হেমাঙ্গিনীর গণ্ড বহিয়া রুদ্ধ অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মূর্খ গণেশ মাতার অভিমান সহানুভূতির বাতাসে উড়াইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা করিল না। মোহর-গুলি আদায়ের পূর্ব্বকার গণেশচন্দ্রে ও এখনকার গণেশচন্দ্রে আসমান জমি তফাৎ।

গণেশ পুনরায় বলিল, "তোমার এখন বয়স হয়েছে। কাশীবাসই ভাল। মাসে দশ টাকা মাসহরা দেওয়া যাবে। আমিও অমনি একটা কিছু বন্দোবস্ত করিব ভাবিতেছিলাম।"

হেমাঙ্গিনী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাদের সুখেই আমার সুখ। তাহার অধিক সুখ চাহি না। কালই আমি কাশী যাব। মাসহরা দিবার প্রয়োজন নাই।"

প্রভা নেপথ্যে একটা জেনেরালের মত হাঁকিল, "বাপ্‌রে, কি দর্প! কি অহঙ্কার! আমাদের কিছু নেবেন না। বেশ, তা'তে আপত্তি কার?"

পরদিন বৃদ্ধা দাসী বামীর সহিত হেমাঙ্গিনী কাশী রওনা হইলেন। যাইবার সময় পুত্রপৌত্রাদিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গণেশের ছেলেমেয়েকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। সন্তান হইতে

নিম্নস্তরে স্নেহ যখন শিকড় গাড়িয়া বসে তখন মমতা বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইতে কোন্ অভাগিনীর হৃদয় আকুল না হয় ?

প্রভা এই দারুণ বিচ্ছেদব্যথার সময়ও হেমাঙ্গিনীকে শুনাইয়া ক্ষেমীকে কহিল, "ঠাক্‌রুণের চোখ দুটি সারাদিন ভিজেই আছে। যেন বর্ষার মেঘ !"

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে একটা রোদনের স্বর কেবলই লুটিয়া পড়িতেছিল—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।"

১০

কাশীতে আসিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার সেবায় হেমাঙ্গিনী মন বসাইতে চেষ্টা করিলেন, মন বসিল না। পূজায় বসিলেই পতিদেবতার ও গণেশ এবং তাহার সন্তানদের মুখ মনে পড়ে। আর মনে পড়ে, সেই নবীন যৌবন, কার্ত্তিকেয়তুল্য স্বামীর অতুল প্রেমের সুখময় স্মৃতি। সংসারের প্রখর রৌদ্রতাপের সহিত সেই চিরজ্যোৎস্নাময় অতীতের প্রভেদ কত !

এক মাস, দুই মাস করিয়া এক বৎসর, দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী গায়ের গহনা বেচিয়া উদরান্ন চালাইতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর গণেশ একখানির বেশী পত্র লিখিল না।

অভাগিনী মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন, "এবার হয়তো গণেশ তাহার ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে; বলিবে, "মা ! আমি না বু'ঝে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি, আমায় মাপ কর !" না, তাহার ক্ষমা প্রার্থনায় কাজ নাই, সে সন্তান, চিরকালই ক্ষমার যোগ্য;

শুধু একবার আসুক্ সে, তাহার চাঁদপণা বাছাদের নিয়ে একবার আসুক।" কিন্তু গণেশ বা তাহার পুত্রকন্যা কেহই আসিল না। হেমাঙ্গিনীর হৃদ্‌রোগ বাড়িয়া গেল।

বামী কাশীতে আসিয়া অবধি কর্ত্রীর নিকট হইতে মাহিয়ানা লইত না। হেমাঙ্গিনী নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে সে বলিত, "মা, তোমার নিমক ঢের খেয়েচি। তোমার পাতের প্রসাদেই আমার দিন চলে যায়। বুড়া বয়সে মাইনে নিয়ে কি কর্‌ব ?"

এই দুঃখের দিনে সেবার্থিনী বামীর কৃতজ্ঞতা দেখিয়া হেমাঙ্গিনী মনে মনে বলিলেন, "বামি, তুই ধন্য !"

১১

এদিকে মহা মুস্কিল। গণেশ দেনার দায়ে নানা দেওয়ানি মামলার আসামী তো ছিলই। তায় বিপদের উপর বিপদ। সে জালের অপরাধে ফৌজদারিতেও সোপর্দ্দ হইল। আত্মীয়স্বজনেরা কেহ, এমন কি বড় তরফের কাকা বাবুও এ সময়ে তাহার সাহায্য করিলেন না !

হেমাঙ্গিনীর নিকট তার গেল। তিনি আসিলেন। পুত্রের বিপদে মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। হতভাগিনী তাঁহার অবশিষ্ট গাত্রালঙ্কারগুলি দিয়া গণেশকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। উকীল বাবু হেমাঙ্গিনীর স্বামীর বাল্যবন্ধু হইলেও ধীরে ধীরে বিধবার গহনাগুলি বাক্সজাত করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। ব্যবসায়ে চক্ষুলজ্জা করিলে চলে না। কিন্তু জালের অপরাধে গণেশের গুরুতর কারাদণ্ড হইল।

হতভাগ্যকে যখন বাড়ীর সম্মুখ দিয়া পুলিশপ্রহরীরা হাতকড়ি পরাইয়া লইয়া গেল তখন হেমাঙ্গিনী সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, প্রভা কাঁদিয়া উঠিল, সন্তানেরা মাটিতে লুটাইতে লাগিল। হেমাঙ্গিনীর দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। স্বামী কেবলই চেঁচাইতেছিল। কিন্তু শোকাতুরার মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। তিনি ইহলোকের দুঃখজ্বালার অতীত লোকে 'হরিলালসে' চলিয়া গেলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

১

রমেশ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, হিন্দু হষ্টেলে থাকে। সে এণ্ট্রেন্সে ফার্ষ্ট হইয়াছে, ছাত্রমহলে তাহার খুব নামগৌরব। কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠার পর তাহার আর পাঠে তেমন মন ছিল না। শুনা যায়, সহাধ্যায়ী বন্ধু সুহাসের ভগ্নী জ্যোৎস্নাই এই তপোভঙ্গের কারণ।

রমেশের বন্ধু সুহাস সিমলায় থাকে, থিয়েটার দেখে, ঘোড়দৌড়ে যায়, মিটিংএ ছুটে ও এই সব অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর পাইলে কিছু পড়ে। কেবল মেধাবী বলিয়াই তাহার পরীক্ষার ফল নিতান্ত মন্দ হইতেছিল না। রমেশ সুহাসদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে যাইত, জ্যোৎস্নাকে দেখিবার জন্যই যাইত। তাহাকে দেখিয়া আসিয়া হষ্টেলে আপনার কক্ষে বসিয়া সেই বিধুমুখখানি ভাবিত। কাজেই বই খুলিলেই অক্ষর-গুলি পিপীলিকার সারির মত দেখাইত। পঠদ্দশায় দৃষ্টি প্রেমে অন্তর্মুখী হইলে এরূপ না হইয়া যায় না।

জ্যোৎস্না রমেশের জীবনে একটা স্বপ্নময় আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছিল। পরস্পরে আলাপ না থাকিলেও বালিকার কোমল সুধাবর্ষী কণ্ঠস্বরলহরী, দুরু দুরু হৃদয় কম্পনকারী মৃদু পদশব্দ, রাজহংসীর ন্যায় ললিত গতিবিভ্রম দুইটি ভাসা ভাসা ঢল ঢল নয়ন, উজ্জ্বল মুক্তাপংক্তিসন্নিভ দশনরাজি রমেশের প্রাণের পরতে পরতে নূতন প্রেমের ভাবকদম্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। অতএব সে ভারতীকে ত্যাগ করিয়া জ্যোৎস্নার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিল।

এখন হইতে সে চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকে ও কবিতা লিখিয়া রজনীর অধিক সময় কাটাইয়া দেয়। সতীর্থেরা কিছু জিজ্ঞাসিলে সংক্ষেপে একটা উত্তর দিয়া আপনার চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া পড়ে। সে স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী, কর্ম্মকঠোর জগৎ হইতে বহুদূরে। সুহাসদের বাড়ী গেলে সে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের অলঙ্কারশিঞ্জিত ও অঞ্চলবদ্ধ কুঞ্চিকা-গুচ্ছের ধ্বনি উৎকর্ণ হইয়া শুনে, শুনিয়া উন্মনা হয়, মনে করে জ্যোৎস্না বুঝি আসিতেছে! সুহাসের সহিত কথা কহিতে কহিতে ইতস্ততঃ অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চক্ষু দুটি নত করে। জ্যোৎস্না বাটীর ভিতরে কথা কহিলে সে স্বর তাহার কর্ণে দূরশ্রুত বংশীরবের ন্যায় মধুর শোনায়। কেহ 'জ্যোৎস্না!' বলিয়া বালিকাকে ডাকিলে সেই নামোচ্চারণও তাহার কাছে বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় বোধ হয়।

তরুণ যৌবন জীবনের নববসন্ত। প্রেমের স্পর্শে জগৎ তখন স্বপ্নময়, সুখময় মনে হয়। তখন মূক বাচাল হয়, অ—কবি কবি হয়। অচিরে রমেশ দুই খণ্ড কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলিল। উঠন্ত প্রেম গীতি-কবিতার 'স্পীড' যেরূপ বাড়াইয়া দেয় এমন কিছুতে নয়।

এখন হইতে সে শুধু প্রণয়ের কবিতা লেখে ও হষ্টেলের সহচর নির্ম্মলকে উহা শোনায়,—কলেজের বইগুলিতে উই ধরিয়া গেল। যথা-সময়ে এফ, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তাহার সতীর্থেরা সবিস্ময়ে দেখিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধর রমেশের নাম দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

২

নির্ম্মল রমেশের সকল মর্ম্মকথা জানিত। সে বড় মিশুক লোক,

আমোদ ভালবাসে, কাহার জুতার একপাটি, ছাতা বা বহি লুকাইয়া রাখে, বন্ধুদের খাবারে জোর করিয়া ভাগ বসায়, মধ্যে মধ্যে ভূত সাজিয়া রঙ্গ করে, বয়সে বড় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকেও 'এপ্রিল ফুল' না করিয়া ছাড়ে না।

রমেশ যখন হতাশ প্রেমিকের মত আকুল ভাবে প্রেমাম্বুধিলহরীর ক্রীড়া দেখাইয়া অপূর্ব্ব শব্দচিত্রে তাহার হৃদয়ের আবেগপ্রসূত ভাবরাজি বন্ধুকে বলিয়া যাইত তখন নির্ম্মল অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মনোযোগের সহিত তাহা শুনিত। বুদ্ধিমান সহিষ্ণু শ্রোতা পাইয়া রমেশের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যাইত। সে এইরূপে নির্ম্মলকে সময়ে অসময়ে উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

বেগতিক দেখিয়া নির্ম্মল একদিন রমেশকে বলিল, "আচ্ছা, সুহাসের সহিত আমারও তো খুব হৃদ্যতা আছে। আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রেমের পথ সুগম করিয়া দিব।"

রমেশ কহিল, "কিন্তু জ্যোৎস্নাকে যে পাইবার নয়, সে ব্রাহ্মণকুমারী, আমি কায়স্থ।"

নি। তাহাতে কি যায় আসে? সুহাসরা 'অর্থোডক্স' হিন্দু নয়। বিশেষ প্রেমের রাজ্যে জাতিভেদ নাই।

র। সত্যই ভাই, আমিও ঐরূপই ভাবিতেছিলাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের শ্রেণীভেদে যে প্রকাণ্ড বিরোধকল্পনা উহাই ভারতবর্ষের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। প্রত্যেক বর্ণে নির্দ্ধন্দ্বে মিলনের অন্তরায় যতদিন দূর না হইতেছে ততদিন দেশের কল্যাণ কোথায়?

নি। তাহাতে সন্দেহ আছে ?

র। নির্ম্মল, তুমি আমার ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ! হিন্দুর ঘরে এইরূপ পরিণয়ের আদর্শ ব্যবস্থা করিয়া দেশেরও একটা কাজ কর ভাই।

নি। অবশ্য।

৩

এদিকে রমেশের কয়েকটি কবিতা মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইবামাত্র কলিকাতার ছাত্রেরা নিঃসংশয়ে কহিল,—"রবি ঠাকুরের পর রমেশই বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি হইবে।" বস্তুতঃও আজকালকার অনেক কষ্ট কল্পিত নিরর্থক কবিতার চেয়ে রমেশের কবিতায় কিছু প্রাণ ছিল।

ইতিমধ্যে একদিন রমেশ ও নির্ম্মল সুহাসদের বাড়ীতে গেলে জ্যোৎস্না একখানা "প্রবাসী" হাতে লইয়া দাদাকে জিজ্ঞাসিল, "দাদা, এ দুটি রমেশ বাবুর কবিতা ?"

সু। হাঁ। রমেশ, তুমি বেশ কবিতা লিখ্‌তে পার।

সুহাস এইরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল রমেশকে উৎফুল্লনয়নে ইসারায় জানাইল তাহার হৃদয়প্রতিমার ঐ কবিতাগুলি খুব ভাল লাগিয়াছে।

আর যাইবে কোথায় ? হষ্টেলে বসিয়া রমেশ তাহার কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড শীঘ্র লিখিয়া ফেলিল।

ইহার পর রমেশ তাহার চারি খণ্ড কবিতাপুস্তকের পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া উহা নির্ম্মলের হাত দিয়া জ্যোৎস্নাকে উপহার দিতে দিল। নির্ম্মল বইগুলি সুহাসের হাতে দিতেই সে বিস্মিত হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নির্ম্মল বলিল, "ব্যস্ত হইও না, রমেশের ব্যাধির আমি প্রতিকার করিব।"

এই ঘটনার পর হইতে সুহাস রমেশের সঙ্গে যেন আর পূর্ব্বের মত মেশে না। রমেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। নির্ম্মল বলিল, "কেবল শুষ্ক আলাপে সম্বন্ধীকে তুষ্ট করা যায় না। মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিতে হয়।"

রমেশ তাহাই করিল। জ্যোৎস্নার দাদাকে খুসী করিতে সে কি না করিতে পারে? শীঘ্রই মহৎ আশ্রম হইতে চপ্ কাট্‌লেট্ প্রভৃতি, ভীম-নাগের দোকান হইতে সন্দেশ ও বাগবাজার হইতে রসগোল্লা ক্ষীরমোহন আসিল। সুহাস, নির্ম্মল ও আর দশজন বন্ধুবান্ধব পরিতৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিল।

এইরূপ মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে সুহাস বা নির্ম্মলের কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু রমেশের ব্যয় বাড়িয়া গেল।

নির্ম্মল তাহাকে বুঝাইত, "ভাই, বড় লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ কর্‌তে গেলে কিছু খরচ না হয়ে যায় না। এর পর জন্ম ভ'রে যা কর্‌তে হবে এ তো তাহারই আভাস মাত্র। জ্যোৎস্নাকে পেলে তোমার সব খরচ পুষে যাবে!"

রমেশও তাহাই বুঝিয়াছিল।

তাহার বিচিত্র কাণ্ডে সুহাস এখন হইতে গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মেডিক্যাল কলেজের চৌহদ্দি হইতে ছুটি পাইলেই সে হষ্টেলে আসিয়া নির্ম্মলের সঙ্গে হাসিকৌতুকে যোগ দিতে লাগিল।

৪

একদিন নির্ম্মল বলিল, "শোন রমেশ, সুহাস বলেছে জ্যোৎস্না বড় গান ভালবাসে। তোমাকে গান শিখ্‌তে হবে। গোলদিঘির ধারে নির্জ্জন সময়ে তুমি উহা অভ্যাস কর্‌তে পার।"

রমেশ কিছু কুণ্ঠা বোধ করিতেই নির্ম্মল বলিল, "জ্যোৎস্নাকে সুখী কর্‌তে, তোমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় কর্‌তে তুমি এইটুকু কষ্ট স্বীকার কর্‌তে পার না?"

হষ্টেলে গাহিবার সুবিধা হয় না, অন্যের পাঠের ক্ষতি হয়। অগত্যা রমেশ সান্ধ্যবায়ু সেবনের পর ছাত্রেরা চলিয়া গেলে গোলদীঘিতে প্রাণপণে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু গাহিতে গেলে কথাগুলিই কেবল স্পষ্ট হয়, সুর হয় না; অথবা, সুর যদি বা কিছু হয়, গানের কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যায় না। এই ভাবে একমাস কাটিল।

মাস খানেক অভ্যাসের পর নির্ম্মল বলিল, "তবে বলে তুমি গাইতে পার্‌বে না? তোমার চেহেরা দেখেই আমি ধরে ফেলেছিলাম, তুমি একজন ভাল গাইয়ে হবে। কেমন, আমার 'ডায়াগ্‌নোসিস্‌' ঠিক্‌ কিনা?"

রমেশ ঈষৎ হাস্য করিল।

তার পর নির্ম্মল একদিন তাহাকে লইয়া সুহাসদের বাড়ীতে গেল। অনেক অনুরোধের পর রমেশ গাহিল; নির্ম্মল হারমোনিয়াম বাজাইতে লাগিল।

গান শুনিয়া সুহাস বলিয়া উঠিল, "প্যাথেটিক্‌!" রমেশ সেদিন আর গাহিল না। তাহার মনে কেমন এক খট্‌কা লাগিয়াছিল।

নির্ম্মল তাহা লক্ষ্য করিয়া পথিমধ্যে সুহাসকে বুঝাইল, "রমেশ, তোমার গান বাস্তবিকই বড় প্যাথেটিক্ হয়েছিল, সুহাস ঠিক্ ধরেছে। কেন, জ্যোৎস্নার চোখে তুমি কি প্রশংসার ছাপ দেখ্‌তে পাওনি?"

রমেশ সোৎসাহে কহিল, "সত্যি?—বল কি নির্ম্মল?"

নি। হাঁ ভাই, সে তোমার গান খুব 'অ্যাপ্রিসিয়েট্' করেচে।

ইহার পর আর একদিন নির্ম্মল বলিল, "রমেশ, তোমায় নাচ শিখ্‌তে হবে। জ্যোৎস্না কলিকাতার মেয়ে, থিয়েটার দেখার অভ্যাস, নাচ বড় ভাল বাসে।"

র। সে আর এমন কি শক্ত কথা?

রমেশ ক্ল্যাসিক থিয়েটারে নেপা বোসের নাচ দেখিয়া আসিয়া তাহার অনুকরণে আপনার কামরা বন্ধ করিয়া প্রত্যহ নাচিতে আরম্ভ করিল।

পক্ষান্ত পরে নির্ম্মল বলিল, "এইবার ঠিক হয়েছে। কাল সুহাসকে নাচ দেখাতে হবে।"

রমেশ অতটা অগ্রসর হইতে রাজি হইল না। অগত্যা নির্ম্মল একাই তাহার নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

৫

ইহার পর পূজার ছুটি আসিল। জ্যোৎস্না তাহার মামা প্রতাপ বাবুর সঙ্গে দেওঘরে বেড়াইতে গেল। মেডিক্যাল কলেজে 'ডিউটি' ছিল বলিয়া সুহাস যাইতে পারিল না।

রমেশ দুর্গাপূজার ছুটিতে তাহার মা ভাই বোন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাড়ী না গিয়া হঠাৎ স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে গেল এবং সেখানে তাহার জনৈক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায় উঠিল।

প্রতাপ বাবু বা তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকায় ও জ্যোৎস্নার সহিত অবাধ প্রণয় ছিল না বলিয়া রমেশ তাহার হৃদয়প্রতিমার বাড়ীতে গিয়া আলাপের সুবিধা পাইল না। অতএব সে কেবল দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া তৃপ্তিসুখ লাভ করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না যখন মামা ও মামীমার সঙ্গে নন্দন পাহাড়ে, পঞ্চানন ঠাকুরের গোলাপবাগে, যোগী বালানন্দের আশ্রমে বা তপোবনে বেড়াইতে যাইত রমেশও তখন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। তাহার অবস্থা দেখিয়া জ্যোৎস্না লুকাইয়া লুকাইয়া হাসিত।

এই ভাবে একটা লোক প্রত্যহ পিছু লয় দেখিয়া প্রতাপ বাবুর স্ত্রী একদিন জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ ছোক্‌রা তোকে চেনে বলে মনে হয়। এ কে, জ্যোৎস্না ?"

জ্যো। দাদার বন্ধু রমেশ বাবু।

মামী। বটে ?—তা' অমন ক'রে পিছু নিয়েছে কেন ?

তখন জ্যোৎস্না দাদার কাছে রমেশ বাবুর যে সব রহস্যজনক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। উহা শুনিয়া 'হুঁ' বলিয়া মামীমা মামার সহিত একটা ফন্দি আঁটিলেন। বুড়াবুড়ী দুজনাই রসিক লোক। রঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল, রমেশের যৌবনের রোগ দূর করিতেও ইচ্ছা হইল।

পরদিন বেড়াইবার সময় রমেশ পূর্ব্বের ন্যায় জ্যোৎস্নাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, এমন সময়ে প্রতাপ বাবু হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার নাম রমেশ বাবু ? আপনি সুহাসের বন্ধু ? তা' এতদিন আমাদের সঙ্গে দেখাশুনা করেন নি কেন ?

বড় লাজুক আপনি। যাহোক, কাল সকালবেলা অবিশ্যি অবিশ্যি আমাদের বাড়ীতে আসবেন।"

রমেশ কৃতার্থন্মন্য হইয়া সলজ্জে বলিল, "যে আজ্ঞে।"

পরদিন সকালে সে জ্যোৎস্নার মামার বাসায় যাই উপস্থিত হইল অমনি প্রতাপ বাবুর স্ত্রী তাহাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার কাব্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ড লইয়া উপস্থিত হইলেন ও সেই বহির প্রথম পৃষ্ঠার গানটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন,—

তুমি গো আমার সান্ধ্য তারা,
ঢাল ঢাল হৃদে শান্তিধারা!
ও অমিয় কিরণ বিনা বাজে কি হৃদয়বীণা?—*
পরাণ হাসিবে না, লক্ষ্য হইব হারা।
আমার জীবনতরী বহিবে না ধীরি ধীরি,
জ্যোছনা যাইবে চলে আঁধার হিয়ায় ঘুরি';
বসন্ত আসিবে না, মলয় বহিবে না,
মুহুর্মুহু কুহু কুহু কোয়েলা গাহিবে না,
রুদ্ধ হবে না মোর আকুল নয়ন-ধারা!

এমন সময় নেপথ্য হইতে "বাহবা, বেশ! বাহবা বেশ!" বলিতে বলিতে প্রতাপ বাবু সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন ও জ্যোৎস্না আড়াল হইতে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিল।

---

* মিশরে অবস্থিত মেম্‌নের মূর্ত্তি প্রথমপ্রভাতকিরণসম্পাতে তন্ত্রীর ন্যায় বাজিয়া উঠিত, প্রবাদ আছে।

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া যাইতে উদ্যত হইলে প্রতাপ বাবু বলিলেন, "আহা সে কি হয়? বসুন, বসুন, জামাই হবেন আপনি। কলেজে পড়্‌চেন, ইংলিশ শিখেছেন, বামুনের মেয়ে বিয়ে কর্‌বেন না?" অত উতলা হ'লে চল্‌বে কেমন ক'রে, রমেশ বাবু?"

রমেশ লজ্জায় অপমানে ছল ছল চক্ষে "ক্ষমা করুন, আমায় যেতে দিন্" বলিয়া কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল ও সেই রাত্রেই বাড়ী রওনা হইল।

ছুটির পর সে আর হষ্টেলে আসিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে নাম কাটাইয়া কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্ত্তি হইল, পড়াশুনায় তাহার আবার আগের মত মন বসিল ও সে কৃতিত্বের সহিত বি-এ, পাশ করিয়া ছয় মাসে এম-এ, দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল। জাতিভেদপ্রথা তুলিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার আর ছিল না।

বনিয়াদি ঘর।

১

করুণা বাবু বিপত্নীক। তাঁহার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলেটি এম-এ, দিয়া আসিয়া হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। এখন অমলা ও অনুপমাই তাঁহার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি।

এটর্ণিগিরি করিয়া করুণা বসু অজস্র রোজগার করিয়াছেন। লোক-মুখে 'ধনকুবের' বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে তাহাকে নিজের পশারে বসান হইল না দেখিয়া, আর অধিক রোজগারে প্রয়োজন ও মন ছিল না বলিয়া, বিশেষ ইদনীং দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাইতেছিল বিধায় তিনি ব্যবসায় ছাড়িয়া বালীগঞ্জের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এখন তাঁহার একমাত্র অভিলাষ, কন্যা দুইটির কোন বনিয়াদি বংশে বিবাহ দিয়া যান। কলিকাতায় এমন একটি সম্বন্ধ স্থাপনে তাঁহার পূর্ব্বাবধি ইচ্ছা ছিল। কুলোকে বলে, করুণা বাবু পূর্ব্বে জাত্যংশে তেলী ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম বাঙ্গালার কোন ভদ্রসন্তানের অবিদিত। সম্ভবতঃ বনিয়াদি ঘরে কন্যাদের বিবাহ দিবার ইচ্ছার মূলে সমাজে মানগৌরব লাভ।

২

অমলার বয়স আঠার, অনুপমা ষোড়শী। অমলা স্থিরা, গম্ভীরা; অনুপমা অধীরা, চঞ্চলা; উভয়েই রূপসী, তন্বঙ্গী, উছলিতলাবণ্যা। অমলা প্রেম কি তাহা বুঝিতে শিখিয়াছে, অনুপমা ভালবাসাবাসির ধার ধারে না, পুরুষ জাতিকে প্রাণ দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করে

না, বরং তাহাদিগকে রমণীগণের স্বাধীনতা অপহারক অদ্ভুত জীব মনে করে।

মিষ্টার মনোময় মাইতি বিলাতপ্রত্যাগত গ্রাজুয়েট। তাঁহার পিতা (কমিসেরিয়েটের বাবু) অনেক টাকা ব্যয় করিয়াও তাঁহাকে ব্যারিষ্টার করিয়া আনিতে পারেন নাই। বি, এ পাশের পর ইনে মাইতির নূতন বন্ধু জুটিয়া গিয়াছিল। বিশেষ, তিনি হৃদয়ের আবেগ অনুরাগের অভিনয়-দর্শনে যে আনন্দ পাইতেন তাহা নীরস ইংরেজি ও রোমক আইনে পাইতেন না। অপেরায় যে সুখ, কোয়াড্রিল গ্যালপ পোল্কা প্রভৃতি নাচে যে উত্তেজনা তাহা শুষ্ক আইন-চর্চ্চায় নাই। অতএব তিনি অধ্যয়ন ছাড়িয়া সংসর্গগুণে থিয়েটার, নাচ ও বন্ধুদের চোখ টেপাটেপি, হৃদয় কাড়াকাড়ি দেখিয়া বেড়াইতেন। ফলে 'বারে' 'কল্ড' হইলেন না। মিঃ রসিকচন্দ্র মাইতি নামে তাঁহার এক বন্ধু সিভিল সার্ভিস্ পড়িত। সে ক্যাথারাইন নাম্নী জনৈক শ্বেতাঙ্গিনীকে "ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং" বলিয়া তাহাকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিবার প্রলোভন দেখায়। মনোময়ের পিতা শুনিতে পান তাঁহার পুত্র মিঃ মাইতিই বিগড়াইয়া গিয়াছে। সেই সূত্রে রসিকের দোষের জন্য অপবাদ রটে 'ইনে'র মাইতিরই।

বিলাতফেরত মিঃ মাইতি এখন করুণা বাবুর প্রতিবেশী। অমলাকে দেখিয়াই তিনি তাহার রূপে গুণে মজিলেন। অমলাও প্রথম দর্শনে তাঁহাকে হৃদয় দিয়া ফেলিল। করুণা বাবু মনে করিয়াছিলেন, অমলা ও মনোময়ের আলাপ পরিচয় ভাসা ভাসা ভদ্রতা, মুখের মিষ্টতা মাত্র,—অমলা এমন কাঁচা মেয়ে নয় যে যা'কে তা'কে ভাল

বাসিবে। কিন্তু পরে তাহাদের হাবে ভাবে ব্যাপার কিছু গুরুতর দাঁড়াইতেছে দেখিয়া তিনি অমলাকে মাইতির আশা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, আর তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যে ঘোরতর অসচ্চরিত্র তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। মিঃ মনোময় মাইতির সংক্রান্ত গুজব যে মিথ্যা তাহা তিনি পরে জানিতে পারিয়াও কন্যাকে মিথ্যা কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কারণ এটর্ণি করুণা বাবুর লক্ষ্য বনিয়াদি ঘর, মাইতিকে এড়ানই তাঁহার অভিপ্রেত। তাই তিনি মিঃ মাইতিকেও স্পষ্ট বলিলেন, "আপনি আমার কন্যাকে পাবার আশা ছেড়ে দিন। আমার বাসায় আর না এলে সুখী হব।" সরলা অশ্রু বিসর্জ্জন করিল, কিন্তু তাহার বিশ্বাস হইল না মিঃ মাইতির স্বভাব এতদূর মন্দ। প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ বন্ধ হইলেও প্রণয়ীযুগলের গুপ্তমিলনের অসুবিধা হইল না। হৃদয়াবেগ দুর্দ্দমনীয় হইলে কবে তাহার বৈপরীত্য ঘটে? অমলা মিঃ মাইতির হাতে হাত রাখিয়া অনেক কাঁদিল। মাইতি কহিলেন, "আমাকে যে অসচ্চরিত্র বলে সে আমাকে চেনে না। বিলাতে গিয়া বিগড়াইয়া গেল রসিক মাইতি, দোষ হইল আমার। এখানে এসে অবধি এতদিন আছি, কই, কলিকাতায় কেউ তো আমার কোন অপবাদ রটাতে পারিল না? আমি অমনোযোগী বলিয়াই কল্ড হই নাই। এতদিন জীবনতরী নিয়ন্ত্রিত করিবার ধ্রুবতারা ছিল না। এখন তাহা পাইয়াছি। অগ্নি অপবিত্র বস্তু পবিত্র করে, গঙ্গাজলে সকল কলুষ নষ্ট হয়, প্রেমের স্পর্শে সকল দোষ, সকল অভাব দূর হয়। অমলা, তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, যে তোমার মত গুণবতীর মনে একটুও শ্রদ্ধাভক্তি অঙ্কিত করিতে পারে সে কি করুণা বাবুর চিত্রিত নরাধম হইতে পারে? এতদিন

আমি বুঝি নাই, প্রেম কি, মাধুরী কি, সুন্দর মুখের অন্তরালে সুন্দর হৃদয় কেমন, মর্ত্ত্যের কুটিলতা—পঙ্কিলতার মধ্যে দেববালার সরলতা-শুচিতা কি? যেই তোমায় দেখিলাম, অমনি আমি আপনা হারাইলাম, জন্মজন্মান্তরের হারানিধি ফিরাইয়া পাইলাম, জীবনের ঘনান্ধকারে অকস্মাৎ সহস্র সূর্য্য প্রকাশিত দেখিলাম। বুঝিলাম, আমার প্রাণ যাকে চায় এ সেই দেবীপ্রতিমা।" অমলার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। সে প্রেমের ভাদ্রস্রোতে ভাসিয়া চলিল। বলিল, "মিষ্টার মাইতি, আমায় ক্ষমা কর, ক্ষণিকের জন্যও যদি আমার হৃদয় তোমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে সে জন্য ক্ষমা কর! আমি তোমারই।"

৩

একদিন করুণা বাবু বেড়াইয়া আসিয়া অমলাকে বলিলেন, "যতীন্দ্র বাবুর সেজ ছেলের সহিত তোমার সম্বন্ধ প্রায় স্থির হইয়াছে। তিনি আমাকে কয়েক দিন পরে তাঁহার পূর্ণ অভিমত জানাইবেন বলিয়াছেন। কলিকাতায় যতীন বাবুদের মত বনেদি ঘর বেশী নাই।"

অমলা ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। করুণা বাবুর সন্দেহ হইল, প্রলুব্ধা এখনও মনোময়ের আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। তার পর ঘটনাচক্রে প্রকাশ পাইল, মিঃ মাইতি প্রতিদিন অমলার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হৃদয় চুরি করিয়াছে। যুবতীর পিতার চোখে ধূলা দিয়া এতদূর কাণ্ড হইয়া গেল, তিনি কিছু জানিতে পারিলেন না, ইহাতে করুণা বাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে তিনি কন্যা দুটিকে প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমার শরীর

অনেকদিন হ'তেই ভাল থাকৃচে না, চেঞ্জ দরকার। আজই আমরা মুশৌরী যাব।"

অমলা মিঃ মাইতিকে কোন খবর দিতে না পারে, তাহার সহিত দেখা করিতে না পারে, এমন ভাবে সতর্কতার সহিত ও তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

করুণা বাবু কন্যা দুইটিকে লইয়া মুশৌরীতে আসিলেন। কিন্তু অমলা দিন দিন ছিন্নলতার ন্যায় শুকাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অনুপমা বলিত, "দিদি পরের হাতে প্রাণ দিয়ে কি ফল তাহা তো দেখ্‌তেই পাচ্চ। আমি বরাবর বলিনি, পুরুষ জাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই, ভাল বাসিতে নাই! স্ত্রীজাতিকে কাঁদাইবার জন্যই তাহাদের জন্ম।"

"আমার তো কিছু হয় নি" বলিয়া অমলা সে কথা উড়াইয়া দিত। তাহাতে অনুপমা কহিত, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ,—অশ্রু, তপ্তশ্বাস, শরীরের কৃশতা যাহার বহির্বিকাশ তাহার মূলে পুরুষের চটুল বচনে ও প্রেমের ভানে বিমুগ্ধতা। আমার প্রতিজ্ঞা হইতেছে, কোন পুরুষকেই ভাল বাসিতে নাই, মিঃ মাইতি পুরুষ, সিদ্ধান্ত—তাহাকে ভালবাসিও না।"

অমলা সংক্ষেপে বলিল, "বালিকা তুই, কি বুঝিবি?"

বস্তুতঃ, যুবতীর হৃদয়ে যে আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহা বুঝিবার লোক মুশৌরীতে ছিল না। এমন সঙ্গী নাই যাহার কাছে অমলা হৃদয় খুলিয়া দুইটি কথা বলিতে পারে।

সে মিঃ মাইতিকে পত্র লিখিলে তাহা পথিমধ্যেই অন্তর্হিত হয়, পোষ্ট মাষ্টার তাহার চিঠি করুণা বাবুকে ফেরত দেন। মিঃ মাইতির

চিঠিও তাহার হাতে পড়ে না। সে যেন তুরস্কের বন্দিনী। মাইতির ও তাহার ভিতরে কলিকাতা হইতে মুশৌরীর বিস্তীর্ণ ব্যবধান।

ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে যতীন বাবুর ছেলের সঙ্গে অমলার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। মিঃ মাইতি কিন্তু প্রণয়িণীর বিরহ আর সহিতে পারিলেন না। যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে পাইতে হইবে, পাইয়া করুণা বাবুর মতামতের অপেক্ষা না করিয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে, তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে শীঘ্রই মুশৌরীতে অমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। একদিন গোপনে মিঃ মাইতি অমলার দেখা পাইলেন ও তাহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "অমলা! অমলা!"

অমলা আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলিল, "মিষ্টার মাইতি!"

মিঃ মাঃ। আর যে দেখা হ'বে তার আশা ছিল না। অমলা, তুমি আমায় এখনও আগের মত ভালবাস?

অ। বাসি বৈ কি!

আনন্দে অধীর যুবকযুবতী চুম্বনে ও আলিঙ্গনে বহুদিনের বিরহজ্বালা মিটাইল। তার পর উভয়ে তাহাদের প্রাণের লুকানো কত কথা বলিল।

মিঃ মাইতি বলিলেন, "শোন অমলা, আমাদের মিলনের একমাত্র অন্তরায় তোমার পিতা। তিনি তোমায় অন্যের হাতে সমর্পণ করিতে অভিলাষী। সত্যই যদি তুমি আমায় ভালবাস তবে আজ রাত্রেই আমার সহিত পালিয়ে এস, লুকাইয়া বিবাহ করিব।"

অ। তাহাতে বাবার মনে খুব আঘাত লাগিবে। তাঁহাকে অমনি

ঢের অসুখী করেছি, পালাইয়া গিয়া তাঁহার মনের অশান্তি বাড়াইতে ইচ্ছা নাই।

মিঃ মাঃ। তবে তুমি আমায় ভালবাস না। তোমার প্রেম কত অগভীর তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

অমলা এই নিষ্ঠুরবাক্যে অশ্রুমোচন করিল। বলিল, "হৃদয় উপাড়িয়া দেখাইতে পারিলে দেখাইতাম আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

মিঃ মাঃ। তবে পালাইবে না কেন? পালাইয়া আমাকে তোমার আপনার করিবে না কেন? অমলা, এ যাতনা আমি আর সহিতে পারি না। করুণা বাবুকে তোমায় কাহারও হাতে সঁপিতে দিব না। ইহাতে প্রাণ যায় তাহাতেও রাজি আছি।

এই বলিয়া মিঃ মাইতি উন্মাদের ন্যায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর ঝড় উঠিয়াছে। করুণা বাবুর কৃত প্রত্যাখ্যান ও অপমানের কথা স্মরণ হইতেই তিনি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর অমলার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ মাইতি বলিলেন, "এখনই আমার সহিত চল। নইলে আমাদের মিলনে যে বাদ সাধিয়াছে আজ রাত্রেই তাহাকে হত্যা করিব।"

অমলা শিহরিয়া উঠিল। সে সকাতরে বলিল, "ওগো, সময় দাও, আমায় চিন্তার সময় দাও!"

মিঃ মাঃ। এক মুহূর্ত্তও না। বল, আমার সঙ্গে যা'বে কিনা?

অ। মিঃ মাইতি, তুমি এত নিষ্ঠুর! আমার একটি অনুরোধও রাখিবে না?

মিঃ মাঃ। আমি পাগল, পাগল কাহারও অনুরোধ শোনে না। বল, যাবে কিনা?—তবু চুপ ক'রে আছ?—কেমন, তবে যাবে না তাই ঠিক্—আচ্ছা!

উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে মিঃ মাইতি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অমলা ডাকিল, "দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও!"

কোন প্রত্যুত্তর হইল না।

৫

রাত্রে আহারের পর একখানা বই লইয়া ড্রয়িং রুমে বসিয়া অনুপমা ইউরোপীয় মহাসমরের কাহিনী তাহার পিতাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। অমলা অনুপমাকে বলিয়া দিয়াছিল, সপ্তম পরিচ্ছেদটা তুমি আজ বাবাকে শুনাইবে, বড় বিস্ময়কর অপূর্ব্ব ঘটনা। বাস্তবিকও উহা খুব হৃদয়গ্রাহী। করুণা বাবু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনুপমার পঠিত ঘটনাবলী শুনিয়া যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া অমলা উঠিয়া আসিল ও একখানা বই হাতে লইয়া পিতার শয্যায় শুইয়া পড়িল। একঘণ্টা পরে করুণা বাবু আসিয়া দেখিলেন, অমলা কি পড়িতে পড়িতে তাঁহার বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনুপমা ডাকাডাকি করিতেই করুণা বাবু বলিলেন, "ওকে ডেকো না। নৈরাশ্যের বেদনায় ও বড় কাতর। ওকে ঘুমুতে দাও।"

করুণা বাবু অমলার শয্যায় শুইতে গেলেন। অমলা এতক্ষণ নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়াছিল। তাহার নিদ্রা আসিতেছিল না। পুঞ্জীভূত ভাবতরঙ্গের আলোড়নে তাহার চিত্তসমুদ্র ক্ষুব্ধ ও মথিত।

ভাবিতে ভাবিতে অমলা ঘুমাইয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ নিশীথিনী অন্ধকারময়ী। হঠাৎ করুণা বাবুর কক্ষের জানালার নিকট দ্রুত মনুষ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। তারপর খট্ করিয়া পিস্তলের শব্দ হইল। আততায়ী ক্ষিপ্রপদে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পিস্তলের শব্দে করুণা বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি আপনার কক্ষে গিয়াই দেখিলেন, অমলার মৃতদেহ তাঁহার পালঙ্কের উপর পড়িয়া আছে, রক্তনদীতে শয্যা আপ্লুত হইয়াছে। তাঁহার সন্দেহ হইল, অমলা ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। কই, সে তো কোন দিন তাঁহার শয্যায় শোয় না! ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার ন্যায় তাহার কাল রাত্রির স্তব্ধ ভাব। মিঃ মাইতি বোধহয় গোপনে মুশৌরীতে আসিয়া কণ্টক দূর করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে অমলাকে হত্যা করিয়াছেন।

পরদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল, প্রবাসী এটর্ণি করুণা বাবুর কন্যাকে কাল রাত্রে কে খুন করিয়াছে। মিঃ মাইতির কর্ণেও যথাসময়ে এ সংবাদ পঁহুছিল। আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অমলা যে তাহার পিতাকে বাঁচাইতেই এরূপ করিয়াছে তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন।

ইহার পর করুণা বাবু শুনিলেন, একজন সাহেবি বেশধারী বাঙ্গালী পিস্তল দিয়া আপনার মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়াছে।

করুণা বাবুর বুঝিতে বাকি রহিল না, তাঁহার সকল অনুমান সত্য। তিনি শোকভারনতমুখে অমলার গোরের পার্শ্বে মিঃ মাইতির কবর দেওয়াইলেন।

৬

এই ঘটনার পর একদিনে করুণা বাবুর সকল কেশ শুক্ল হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে তিনি বড় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন, কাহারও সহিত তেমন কথাবার্ত্তা বলেন না।

কলিকাতায় আসিয়া করুণা বাবু সাহিত্যশিরোমণিগণের গ্রন্থপাঠে মন দিলেন, মন বসিল না। উদ্যানসংস্কারে ব্রতী হইলেন, তাহা ভাল লাগিল না। পুরাতত্ত্বালোচনায় নিরত হইলেন, উহা নীরস বোধ হইল। কেবল ভাল লাগিল, অনুপমার মাতৃবৎ যত্ন সেবা। সে তাহার হতভাগ্য পিতাকে সুখী করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

করুণা বাবুর এখন অনুপমাই সব। দুই সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর সেই কেবল আছে! করুণা বাবুর সমস্ত হৃদয় ঐ একটি অয়স্কান্ত মণিতে আকৃষ্ট হইয়া রহিল।

এই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। অনুপমা কন্যা হইতে একেবারে মাতৃসদৃশা হইয়াছে, ধীরা গম্ভীরা হইয়াছে। শোকাতুর বৃদ্ধ করুণা বাবুর মনঃকষ্ট নিবারণ করিতে সে নানা ক্ষুদ্র তুচ্ছ আকর্ষণের বস্তু সৃজন করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনে নিয়ত ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে করুণা বাবুর সহিত জনৈক বনেদি ঘরের বড় লোকের আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহার নাম মিঃ সুপ্রসন্ন ঘোষ, বয়স সাত চল্লিশ, দাড়ি গোঁফ কামান, এক চোখে চশমা। করুণা বাবুর সঙ্গ হইতে তিনি তাঁহার কন্যার সঙ্গ বেশী ভাল বাসিতেন। মিঃ ঘোষ আজ সাত বৎসর হইল বিপত্নীক। অনুপমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আর বিবাহ না করিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া

তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। তিনি অনুপমাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইলেন। কিন্তু তরুণী প্রৌঢ় ঘোষ সাহেবের হৃদয়ের এ সব তথ্য আদৌ জানিত না, জানিতে চেষ্টা করিত না, কেবল পিতার বন্ধু জ্ঞানে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত মাত্র।

একদিন অনুপমার মনোভাব বুঝিবার জন্য মিঃ ঘোষ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "অনুপমা, তুমি কখনো কাহাকেও ভালবেসেছ?"

অনুপমা বলিল, "সেকি মিঃ ঘোষ,আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন কর্‌চেন কেন?"

মিঃ ঘো। প্রয়োজন কিছু নেই। অমনি জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

অ। যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহা জানিতে চাওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

মিঃ ঘোষ আর এক দিন বলিলেন, "অনুপমা, তুমি অমিয় নাথকে বিবাহ কর্‌বে?"

অ। কখনো না।

মিঃ ঘো। কেন?

অ। বিবাহ বিড়ম্বনা, জীবনের প্রধান ভ্রান্তি, অনাবশ্যক অশান্তি। বিশেষ, অমিয়নাথ আমার ভাইএর মত।

মিঃ ঘো। তবে চিরকৌমার্য্যই ভাল মনে কর?

অ। শতবার।

ইহার পর মিঃ ঘোষ এ বিষয়ের আলোচনায় আর অধিক অগ্রসর হওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন না।

অমিয়নাথ পাড়ার ছেলে, এম্. এস্. সি পড়ে, খুব সুপুরুষ, শান্ত, সুশীল। অনুপমাকে তাহার বড় ভাল লাগিত। সে অবসর পাইলেই করুণা বাবুর বাড়ীতে আসিত, গল্প স্বল্প করিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ দিত।

তাহার হৃদয় ক্রমে এম্. এস্. সি কোর্স ছাড়িয়া অনুপমাময় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে কোন দিন লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া অনুপমাকে তাহার প্রাণের আকুল আবেদন জানাইতে সাহস পায় নাই। বলিতে গেলেই কেমন বাধ বাধ ঠেকিত, বলি' বলি' করিয়া বলা হইত না। অনুপমাও কোন দিন তাহাকে ভাই ছাড়া অন্য ভাবে দেখিত না।

প্রণয়ীপ্রণয়িনী দুইয়ে এক। কিন্তু অমিয়-অনুপমা এক করপল্লবে দুইটি অঙ্গুলীর মত, এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত, সমান্তরালে প্রবাহিত দুইটি শাখানদীর মত পাশাপাশি রহিত, কিন্তু মিলিয়া এক হইত না।

মিঃ ঘোষের বিশ্বাস, এই যুবক অমিয়নাথই অনুপমার হৃদয় চুরি করিয়াছে। একটা ছোক্‌রার সহিত তাঁহার মত সম্মানিত কৃতবিদ্য অভিজ্ঞ লোক আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না ভাবিয়া তিনি অমিয়নাথের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। সে তাঁহার দুই চক্ষের বিষ হইল। কিন্তু করুণা বাবুর বাড়ীতে তাহার আনাগোনা বন্ধ হইল না। তিনি ভাবিলেন, অনুপমা অমিয়নাথকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসে, কিন্তু তাঁহাকে কেবল সম্মান করে। তাই তিনি করুণা বাবুর নিকট অনুপমার সহিত শীঘ্র আপনার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া অমিয়নাথকে নিরাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৭

যথাসময়ে করুণা বাবু, মিঃ ঘোষের অভিপ্রায়. জানিতে পারিয়া এরূপ বনিয়াদি বংশের যোগ্য বরের হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে মনস্থ করিলেন। উচ্চবংশের মোহ তাঁহার এখনও দূর হয় নাই।

করুণা বাবু অনুপমাকে কহিলেন, "মা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমার ইচ্ছা তোমার বিয়ে দিয়ে সুখী হই।"

অনুপমা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "বাবা, আমরা যেমন আছি তাই ভাল, সেই পরম সুখের। অন্যের অধীন হ'লে আমি আপনার সেবা যত্নে বঞ্চিত হব, স্বাধীনতা হারাব। আপনি এ চিন্তা মন হ'তে একেবারে দূর করুন।"

ক। তা কি হয় মা?

এদিকে মিঃ ঘোষের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে করুণা বাবু তাঁহাকেই কন্যাদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

প্রতিশ্রুতি লাভের পর মিঃ ঘোষ অনুপমাকে বলিলেন, "তুমি আমার হইবে এ বিষয়ে তোমার পিতা আমাকে কথা দিয়াছেন। আশা করি, এখন হইতে তুমি আমাকে ভিন্ন চক্ষে দেখিবে।"

অনুপমা সবিস্ময়ে কহিল, "সে কি, মিঃ ঘোষ? আমাকে তো আপনার অনুগ্রহের কথা এর পূর্ব্বে একদিনও ঘুণাক্ষরে জানান নাই! আমার অভিমতের প্রয়োজন বোধ না ক'রে আপনি যে কেবল বাবার সম্মতি আদায় ক'রে নিশ্চিন্ত আছেন তাহাতে বাধিত হলেম।"

মিঃ ঘো। কন্যার কিসে ভাল হয় না 'হয় তা' পিতাই ভাল বুঝিতে পারেন। বিশেষ তুমি বালিকা, আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পার না— .

অ। তাই সে ভার আপনি গ্রহণ করেচেন! বড় অনুগ্রহের কথা! ভূমি হস্তান্তরের সময় নূতন ভূস্বামী ভূমিকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না, গৃহপালিত পশু বা গৃহের আসবাব খরিদ করতে হ'লে কেহ পশুর বা

আসবাবের মত লয় না, তুর্কি পুরুষ বাঁদী ক্রয়ের সময় বাঁদীর অভিমত জিজ্ঞাসা করে না। পুরুষ স্ত্রীজাতিকে ভূমি, গৃহপালিত পশু, আসবাব বা বাঁদীর মতই দেখে। আপনি তাই আমার মতামত বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানিতে কৌতূহলী হন নি, ইহা খুব সন্তোষের বিষয় বল্‌তে হবে।

মিঃ ঘোষ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, সেটি অন্যায় হয়েছে, অনুপমা! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তোমার পিতার যখন এ বিষয়ে মত হয়েছে তখন তোমার ইহাতে ভিন্ন মত হবে না।"

অনুপমা এ কথার কোন উত্তর দিল না। অবশেষে সে বলিয়া উঠিল, "মিঃ ঘোষ, আপনি এ বিবাহে সুখী হবেন না, আমাকেও সুখী কর্‌তে পার্‌বেন না। অতএব যাহাতে উভয়ের মধ্যে কারও সুখ নেই এমন দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করুন।"

মিঃ ঘো। অসম্ভব, অনুপমা! আলোকে ছায়া আছে ব'লে,—কুসুমে কীট. অমৃতে গরল থাকৃতে পারে ব'লে আলোক, কুসুম বা অমৃত কে ত্যাগ ক'রে থাকে? দাম্পত্যজীবন সুখময় হ'বে না ভেবে কে কবে বিবাহে পরাঙ্মুখ হয়?

"আমায় কিছুক্ষণ একান্তে বিশ্রাম কর্‌তে দিন" বলিয়া অনুপমা উঠিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ঘোষ করুণাবাবুর কক্ষে চলিয়া গেলেন।

অনুপমা কি করিবে,. কিরূপে এই আসন্ন বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবে, ভাবিয়া ঠিক্ পাইল না। একবার তাহার ইচ্ছা হইল পালাইয়া যায়, আবার পিতার কথা মনে হইতেই সে তাহা কল্পনায় স্থান দিল না।

পনের মিনিটের মধ্যে করুণা বাবু কন্যার কক্ষে আসিয়া ডাকিলেন, "অনুপমা !"

অ। বাবা !

ক। *তুমি মিঃ ঘোষকে বলেছ তাঁর সঙ্গে বিয়ে করবে না ?*

অ। বলেছি।

ক। শোন অনুপমা, মিঃ ঘোষ বংশমর্য্যাদায়, আভিজাত্যে, মানসম্ভ্রমে, ধনে, গুণে সর্ব্বাংশে তোমার উপযুক্ত। তিনি আমার সম্পূর্ণ অভিমত পেয়েই তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তাঁকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ ?

অনুপমা চুপ করিয়া রহিল। করুণাবাবু বলিতে লাগিলেন, "তোমার চির-কৌমার্য্য আমার অভিপ্রেত নয়, সঙ্গতও নয়। গৃহিণীত্বে ও মাতৃত্বেই নারীজন্মের সার্থকতা। মিঃ ঘোষকে বিয়ে করতে আপত্তি ক'রো না।"

অ। আমি বিবাহে সুখী হব না। আমায় এরূপ আদেশ করবেন না।

ক। কি আশ্চর্য্য, আমায় প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য লজ্জিত করবে ? সমাজে অপদস্থ করবে ? বুড়া বয়সে অসুখী করবে ?

এই কথা গুলিতে অনুপমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। সে বলিয়া উঠিল, "আমায় একদিন ভাবতে সময় দিন।"

অনুপমা আকাশ পাতাল অনেক ভাবিল। পিতার সুখের জন্য সে আপনাকে বলিদান করিতে প্রস্তুত হইল। অবশেষে করুণা বাবুকে জানাইল, "আপনি যা' বলবেন তাই করব।"

৮

ঘাতকের সহিত বধদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দী যেরূপে বধ্যভূমিতে যায় অনুপমাও সেইরূপে বিবাহমঞ্চে গেল। কিন্তু বিবাহের পর সে স্বামীর সহিত বাক্যালাপও করিল না, শয্যাসঙ্গিনী হওয়া দূরের কথা। মিঃ ঘোষের "অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"; তিনি "শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিতে ভানুর কিরণ" দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অমিয়নাথ অনুপমার বিবাহের পর হইতে করুণা বাবুর বাড়ী আসা বন্ধ করিয়া দিল। অজুহাত, পরীক্ষা সন্নিকট।

অনুপমার মুখে হাসি নাই,—সে যেন পাষাণী। স্বর্ণলতা দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল দেখিয়া করুণা বাবু উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনুপমা বলিত, তাহার কিছুই হয় নাই। ইতিমধ্যে মিঃ ঘোষ তাহাকে লইয়া যাইতে আসিলেন। অনুপমা গেল না, স্বামীর সম্মুখে বাহিরও হইল না। সে টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজে শুধু লিখিয়া জানাইল, "মিঃ ঘোষ, আপনি রূপান্ধ হইয়া কন্যার বরস্কা রমণীর সুখশান্তি বলি দিয়াছেন। আর কেন? আমার এই অসার দেহ লইয়া কি করিবেন? যেখানে হৃদয়ের মিল নাই, কেবল শরীরের সম্বন্ধ সেরূপ অপবিত্র দাম্পত্যজীবন আমি অতি হেয়, অতি ঘৃণিত মনে করি। আমাকে লইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিলে আমার কঙ্কালমাত্র পাইবেন, আমাকে পাইবেন না। বাবাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইব না,—স্বর্গেও না। চিরকুমারী অনুপমা চিরকুমারীই রহিবে।" ক্রমে দম্পতির মধ্যে অন্তরের ব্যবধানের বিষয় ও অন্যান্য সকল কথা করুণা বাবুর কর্ণগোচর হইল। সবিশেষ দেখিয়া

শুনিয়া তিনি বারংবার আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন, "আমারই দোষে অমলা ও অনুপমা সুখী হ'তে পারে নাই, বংশমর্য্যাদার আলেয়ার পিছে ছুটিয়া একটি কন্যার অপমৃত্যুর কারণ হয়েছি, আর একটিকে জীবন্তে সমাধি দিয়েছি !"

ইহার তিনমাস পরে করুণা বাবু হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনুপমা স্বামীর ঘর করিতে গেল না। আপনার বুদ্ধিদোষে আপনি অপ্রতিভ হওয়ায় মিঃ ঘোষ স্ত্রীকে আর লইতে আসিলেন না। আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেলেঙ্কারি বাড়াইতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। অনুপমা ভাবিতে লাগিল, "আমাদের বংশে বিধাতার অভিশাপ আছে, আমরা কেহই সুখী হইতে পারিলাম না। নিয়তির গতি বজ্রের ন্যায় দুর্ব্বার।"

নিয়তি।

১

বৃদ্ধ সর্দ্দার রহমানের নূতন ক্রীতদাসী সুন্দরী যুবতী গুল্‌সন কুঞ্জ কাননে শুইয়া আছে। তাহার মাথার উপরে একটা বুলবুল গায়িতেছে, পায়ের কাছে ফোয়ারা হইতে মুক্তাবিন্দুর উৎস মর্ম্মরশিলার উপর ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, চারিদিকে গোলাপ গন্ধরাজের বকুল-বেলার সৌন্দর্য্য ও সুবাস ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সেই কুঞ্জকানন যেন স্বপ্নময়, আর সেই স্বপ্নরাজ্যে নিদ্রিতা পরীরূপে গুল্‌সন কোন অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতেছে, দেখিয়া হাসিতেছে ও তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল সুন্দরতর শোভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

এমন সময়ে রহমান সেখানে গিয়া গুল্‌সনের সন্নিকটে বসিলেন ও তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তার পর মুখ অবনত করিয়া সুন্দরীর রক্তকুসুমকোরকসন্নিভ অধর চুম্বন করিলেন। গুল্‌সনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগ্রত হইয়া কহিল, "কে,—প্রভু ?"

রহ। তোমার প্রেমপাশে বাঁধা বান্দা রহমান।

গুল্। আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

রহ। বল, গুল্‌সন, তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত বল!

এমন সময়ে সর্দ্দার রহমানের ভ্রাতুষ্পুত্র আলি কুসুমকাননের পুরোভাগে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া উহাকে এক বৃক্ষমূলে বাঁধিয়া কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। খুল্লতাতকে সহসা এক যুবতীর

সহিত রসালাপ করিতে দেখিয়া সে প্রথমতঃ মুখ ফিরাইয়া লইয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। কিন্তু তরুণী পরমা রূপসী। আলির চক্ষে সে শত সুষমা ফুটাইয়া তুলিতেছিল। যুবক আবার সেই মূর্ত্তি দেখিল। দেখিয়া মুগ্ধ হইল। মনে মনে ভাবিল, এ বোধ হয় চাচার নূতন বাঁদী। বড় সুন্দরী,—চিত্রিতা পরীর ন্যায় অতুল মাধুরীময়ী! সে যখন এইরূপ ভাবিতে ছিল তখন রহমানের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "আলি, এখানে? বাজিতপুর থেকে কখন এলে?"

আলি। এই আস্‌চি।

রহ। বড় সকালে ফিরে এসেছ!—সব কুশল তো?

আলি। আজ্ঞে হাঁ।

খুল্লতাত-ভ্রাতুষ্পুত্রের কথোপকথনকালে গুল্‌সন এই কন্দর্পতুল্য যুবকের প্রতি যে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিল তাহা বৃদ্ধ রহমানের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "আলি, বাড়ী যাও, আমি এখনি আসিতেছি।"

আলি চলিয়া গেল। গুল্‌সন সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ যুবকটি কে?"

রহ। আমার ভাইপো আলি।

গুল্। কোথায় গিয়াছিল?

রহ। সম্প্রতি বিবাহ ক'রে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, সেখান থেকে বৌ নিয়ে এসেছে।

গুল্। বৌ দেখিতে কেমন?

রহ। মন্দ নয়,—বড় ঘরের মেয়ে, লাবণ্যময়ী।

গুল্। গৌরাঙ্গী?

রহ। শ্যামাঙ্গী।

গুল্। বড় ভাগ্যবতী সে, তাহার নাম?

রহ্। দরিয়া বিবি!

রহমানের মনে সহসা কেমন এক ভাবের উদয় হইল। তাহা ঈর্ষ্যা কি দুঃখ ঠিক বলা যায় না, বোধহয় উভয়ই। বৃদ্ধ সর্দ্দার ভাবিতে লাগিলেন, তরুণী গুল্সন আলিকে কোন্ চক্ষে দেখিয়াছে?—ইহা প্রেম, না রমণীসুলভ ঔৎসুক্য?

২

বিপত্নীক রহমানের আলিই সব। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালনপালন করিয়াছেন, তাহার বিবাহ দিয়াছেন। সে তাঁহার পরম প্রিয় স্নেহের বস্তু। আলি তাহা বুঝে। তবু সে তাহার হৃদয়বেগ দমন করিতে পারিল না।

নববিবাহিতা দরিয়া বিবি পতির ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়াছিল এমন নয়। কোন্ পত্নী ভর্ত্তার হৃদয়মুকুরে প্রত্যেক ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিতে না পায়? পুরুষের ভাবনা শতমুখী, কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, স্ত্রীজাতিকে বুঝিতে তাহার অবসর কোথায়? কিন্তু সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রমণী প্রণয়ীর চিত্তবিশ্লেষণে সাতিশয় দক্ষা। দরিয়া আলির ভাবান্তর না বুঝিতে পারিবে কেন? সে পতিকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আলি দুঃখের সহিত কহিল, "দরিয়া, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না!"

বিবি কিছুতেই ছাড়ে না। তখন আলি অকপটচিত্তে তাহাকে সকাতরে বলিল, "দরিয়া, আমি বিশ্বাসঘাতক!"

অভাগিনী স্বকর্ণকেও প্রত্যয় করিল না। আলি বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি গুল্‌সনের রূপমুগ্ধ, আমায় ক্ষমা কর,—ভুলিয়া যাও!"

দরিয়ার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সে তখনই তাহা মুছিয়া ফেলিল। তার শ্বশুরের কোপানলে যে প্রিয়তম মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত হইতে পারেন সেই আশঙ্কায় বিষাদিনী শিহরিয়া উঠিল। সে তখন আপনার দুঃখ ভুলিয়া পতিকে কহিল, "পরিতাপ করিও না। পুরুষের পক্ষে চিত্তজয় করা বড় কঠিন। আমার ভয় হয় পাছে গুল্‌সনের জন্য তোমার কোন অনিষ্ট হয়। সময়ে সাবধান হও। শ্বশুর কাহাকেও ক্ষমা করিতে জানেন না।"

আলি। অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে। নিয়তির গতি কে প্রতিহত করিতে পারে? আমি সব ছাড়িতে পারি, গুল্‌সনের চিন্তা ছাড়িতে পারি না। দরিয়া, তোমার অতুল ভালবাসার আমি কোন প্রতিদান দিতে পারিলাম না, দুঃখ রহিল। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, তবু মনকে আপনার বশে আনিতে পারিলাম না।

দরিয়া। আমার জন্য দুঃখ করিও না। তুমি আভ্যন্তরসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, তোমার জন্য কষ্ট হয়। ভাবিতে ভয় হয়, যে বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছ তাহাতে যদি—

আলি। মৃত্যু হয়, তবু ফিরিবার উপায় নাই।

৩

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুসুমকানন, প্রকৃতি হাস্যময়ী। সেই কাননে আলি ও গুল্‌সন পরস্পর নিবিড়াশ্লেষে আবদ্ধ, একের অধর অন্যের অধরে ন্যস্ত, মুখে প্রেমের অর্দ্ধস্ফুট মৃদু ভাষা।

এমন সময়ে সেই কুসুমকাননাভ্যন্তরে সহসা মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল। আলি দূর হইতে খুল্লতাতকে দেখিতে পাইয়া কুরঙ্গের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে রহমান গুল্‌সনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্কশকণ্ঠে ডাকিলেন, "গুল্‌সন!"

গুল্‌সন কিছু বলিল না।

রহমান দৃঢ়হস্তে তাহার করধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গুল্‌সন, তোমাকে সামান্য বাঁদী হ'তে বেগমের হালে রেখেছি, মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি,—এই কি তা'র প্রতিদান?"

গুল্‌সন ইহার কোন উত্তর দিল না। সে সব সহিতে প্রস্তুত ছিল। কেবল একবার ব্যথায় কাতর হইয়া কহিল, "হাত ছেড়ে দাও!" রহমান তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "আমি কঙ্কাল, আলি ইউসুফের মত সুন্দর! তাই তুমি তা'কে প্রাণ সঁপেছ, জীবনের মায়া তুচ্ছ ক'রে ভালবেসেছ! বল, গুল্‌সন! বল, ইহাই সত্য, না সেই বিশ্বাসঘাতক আলি তোমায় মিষ্টবচনে প্রলুব্ধ করেছে? হায় হায়, আমি না জেনে কালসর্পকে ঘরে পুষেছি!"

গুল্। আমি কিছু জানিনে, আমাকে ছেড়ে দাও!

রহ। পাপীয়সি, পিশাচি, এখনও প্রতারণা, এখনও ছলনা?

ইহা বলিতে বলিতে রহমান গুল্‌সনকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

৪

ইহার পর সর্দ্দার রহমান গুল্‌সনকে বহুদূরবর্ত্তী এক গিরিগুহায় বন্দিনী করিয়া তাহার খাদ্য, পানীয় বন্ধ করিয়া দিলেন ও একজন খোজাকে তাহার প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।

আলিও বন্দী হইয়াছিল। কিন্তু দরিয়া বিবির চেষ্টায় বহু বিলম্বে মুক্ত হয়। মুক্তির পরক্ষণেই সে গুল্‌সনের তল্লাসে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গেল। দরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বলিল, "যেওনা, প্রাণেশ্বর! গুল্‌সনের সম্মুখীন হ'লে এবার আর তোমায় জীবন্তে ফিরিয়া পাইব না।"

"গুল্‌সনই যদি মরে, তবে আমিই বা বেঁচে থাকি কেন?" বলিয়া আলি ধূমকেতুর ন্যায় বেগে চলিয়া গেল। সে দরিয়ার মুখে গুল্‌সনের দুর্দ্দশার বিষয় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল। রজনীর অন্ধকারে আঘাত পাইয়া পদে পদে তাহার গতি প্রতিহত হইতেছিল। বাধা বিঘ্ন না মানিয়া সে ঝঞ্ঝার ন্যায় ছুটিতেছিল। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর এক গিরিগহ্বর দেখিতে পাইয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তবে এই কি সেই গিরিগুহা? তাহার দুঃখিনী গুল্‌সন কি এইখানেই বন্দিনী হইয়া আছে?"

খোজা যক্ষের ন্যায় প্রহরা দিতেছিল। গুহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেই সে গর্জ্জিয়া অসি উত্তোলন করিল। আলিও ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

অবশেষে খোজা নিহত হইলে আলি সলম্ফে গুহায় প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "গুল্‌সন!"

কেহ প্রত্যুত্তর না দেওয়ায় আলি আবার ডাকিল, "গুল্‌সন! গুল্‌সন!"

এবার গুহাভ্যন্তর-বাসিনী অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আলি!"

আলি নিমেষমধ্যে বন্দিনীর বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। গুল্‌সন অনশনে শীর্ণ, তাহার হৃদয় বিরহে দীর্ণ। আলিকে

দেখিবার জন্যই তাহার প্রাণ এতক্ষণ দেহপিঞ্জরে ছিল। অপ্রত্যাশিত-ভাবে হৃদয়-সর্ব্বস্বের দেখা পাইয়া তাহার মুখমণ্ডল একবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই মৃত্যুর করালছায়ায় তাহা হীনপ্রভ হইল। আলি তখনও তাহাকে বক্ষে ধরিয়াছিল। প্রণয়িনীর মুখে আর একটি কথাও শুনিতে না পাইয়া সে আবার ডাকিল, "গুল্‌সন!"

কেহ উত্তর দিল না। প্রণয়প্রতিমার শব বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আলি প্রস্তরের ন্যায় সেখানে বসিয়া রহিল।

* * * *

পর দিন প্রাতঃকালে রহমান সেই গিরিগহ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গুল্‌সনের মৃতদেহ বাম হস্তে ধারণ করিয়া আলি দক্ষিণ হস্তে আপন বক্ষ তরবারিবিদ্ধ করিয়া বিগতপ্রাণ, উভয়ের শব সূর্য্য-কিরণে ভয়াবহ দেখাইতেছে!

এই শোকাবহ ঘটনার কারণ তিনিই, ইহা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ সর্দ্দারের বিষম চিত্তবিকৃতি ঘটিল।

এদিকে পতিশোকে দরিয়ায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। স্বামী ভাল হন, মন্দ হন, তবু স্ত্রীর একমাত্র গতি। দরিয়া দিনান্তে একবারও তো আলিকে দেখিতে পাইত। যাহার মুখের দিকে চাহিয়া হতভাগিনী সকল জ্বালা ভুলিয়া ছিল, সেই যখন চলিয়া গেল তখন তাহার আর বাঁচিবার সাধ রহিল না। দরিয়া বিষপানে প্রাণবিসর্জ্জন করিল।

পাশাপাশি তিন জন প্রিয় ব্যক্তির কবর দিয়া রহমান উন্মাদ হইলেন।

এখনও তিনি সেই কালগহ্বরের সম্মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পিশাচের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান এবং তাঁহার বিকট অট্টহাস্যে সেই গহ্বর ধ্বনিত হয়।

রত্ন

১

রত্ন কালী কৈবর্ত্তের মেয়ে, অবীরা, যুবতী। তাহার পিতা পিতামহ কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ীতে খাটিয়া খাইত। এখন সেও ঐ বাড়ীতে কাজ করে। সংসারে তাহার একটিমাত্র ছোট ভাই, আপন বলিতে আর কেহ নাই। দুঃখিনী যাহা পায় তাহা দিয়া ভাইকে মানুষ করে। বালক তাহাকে কখনও "মা," কখনও "দি" বা "দিদি" বলিয়া ডাকে। বস্তুতঃ, সে উহার উভয়ই।

একদিন রত্ন নদীর ধার দিয়া বাবুদের বাড়ী হইতে কাজ করিয়া ফিরিতেছিল। বেলা দ্বিপ্রহর। বাড়ীর বড়বৌএর একটি দশ বছরের ছেলে তাহার সঙ্গীর সহিত ঘাটে বসিয়া কাগজের জাহাজ একবার জলে ভাসাইয়া দিতেছিল, আবার সূতা দিয়া টানিয়া আনিতেছিল। একখানা জাহাজ সূতা ছিঁড়িয়া স্রোতোমুখে কিছু বেশী দূরে গিয়া পড়িল দেখিয়া সে জলে নামিয়া উহা ধরিতে গেল। সঙ্গীর মানা না শুনিয়া সে যেই আর কিছু অগ্রসর হইল, অমনি গভীর জলে ডুবিয়া গেল। দুই বালকই সহরের ছেলে, সাঁতার জানে না, কেবল ছুটিতে বাড়ী আসে। কাজেই সঙ্গীটির পক্ষে বন্ধুর বাড়ীতে খবর দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এদিকে রত্ন বালকটির বিপদ দেখিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল ও নিমেষ মধ্যে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অতিকষ্টে তাহাকে কিনারায় তুলিল। ষোল বছরের স্ত্রীলোকের পক্ষে স্রোত হইতে দশ বছরের ছেলেকে

তোলা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। তবে রত্ন পল্লীগ্রামের মেয়ে, বাল্যাবধি সন্তরণপটু ও বলিষ্ঠ, তাই বালককে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল।

শীঘ্রই ঘাটের ধারে লোকের ভিড় পড়িয়া গেল। কেহ বিপন্নের উদ্ধার করিতে, কেহ তামাসা দেখিতে আসিল। বড় বৌ লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া এলোকেশে পাগলিনীর মত সেখানে রোদন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন ও হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া সকলের সমক্ষে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

জলমগ্নের চিকিৎসার যে সব সহজ প্রক্রিয়া আছে তাহাতে বালক পুনর্জ্জীবন লাভ করিল।

তার পর বাবুদের বাড়ীতে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। রত্নের প্রশংসা লোকমুখে ধরে না। বড় বাবু রত্নকে পুরস্কারস্বরূপ পঞ্চাশ টাকা দিতে চাহিলেন। রত্ন তাহা না লইয়া বলিল, "বাবু, আমি টাকার লোভে দাদা বাবুকে তুলি নাই।"

বাবু বলিলেন, "তুমি গরীব মানুষ, টাকা লও। সংসারে টাকার দরকার কার না আছে?"

রত্ন। হ'লেম দুঃখী, তাই বলে টাকার লোভ কর্‌ব? তিন পুরুষ আপনাদের নিমক খেয়ে এর জন্য পুরস্কার ল'ব? আর, আপনার ছেলে না ডু'বে কোন ভিখারীর ছেলে ডুবিলে তাকেও তুলিতাম। এ এমন একটা ভারি কাজ কি, বাবু?

রত্ন কিছুই লইল না। বড় বৌ তাহাকে বেশী মাহিয়ানা দিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। রত্ন তাহার ভিটা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজি হইল না।

২

সেই গ্রামের একজন জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র গ্রাম্য ইয়ার দলের সর্দ্দার। বাল্যেই বিদ্যালয়ের বাগ্দেবীকে বর্জ্জন করিয়া সে আবকারি বিভাগের আয় বৃদ্ধিতে মন দিয়াছিল। এখন তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ।

রত্ন যুবতী। বাড়ীতে অভিভাবক বা অভিভাববিকা কেহ নাই। তাহার উপর কার্ত্তিকের অনেকদিন হইতেই নজর পড়িয়াছিল। কয়েকটি ইতর শ্রেণীর দুশ্চরিত্রা রমণীকে হস্তগত করিয়া তাহার সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। রত্ন যেদিন বড় বাবুর জলমগ্ন পুত্রকে উদ্ধার করে সেদিন কার্ত্তিকও অন্যান্য লোকের সহিত নদীর ধারে ঔৎসুক্যবশতঃ আসিয়াছিল। সেই সময়ে রত্নকে সে সিক্তবস্ত্রে দেখিতে পায় ও তদবস্থায় তাহার সৌন্দর্য্য সমধিক বিকশিত হইতে দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হয়। এখন হইতে সে প্রতি রাত্রে তাহার বাড়ীতে গিয়া শীষ্ দেওয়া, তাহার বেড়া ধরিয়া টানাটানি ও ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। মুখে ভূতের মুখোষ পরিয়া, গায়ে কালো র‍্যাপার মুড়ি দিয়া, কালো 'পাম্প সু' পায়ে দিয়া সে অপূর্ব্ববেশে অপরূপ সাজিত। বেড়া মড় মড় করে দেখিয়া রত্ন বলিত, "কে? কে?" আগন্তুক বলিত, "ভূঁত।" রত্ন বলিত, "ওঝা ডাকিব?" উত্তর হইত, "না—আঁমি। রত্ন, আঁমি কাঁর্ত্তিক।"

রত্ন। তা, ভদ্দর লোকের ছেলে রাত দুপুরে এখানে কেন?

ভূত। তোমায় ভাল বাসি ব'লে—

রত্ন। ঘাড়ে চাপ্তে এসেছ? তা' আমিও কিছু মন্তর তন্তর জানি। এই থ্যাঙ্গ্রা দিয়ে তোমার মত দুই চারিটা ভূত ঝাড়্তে পারি।

তার পর রত্ন বাহিরে আসিয়াই ভূতের পৃষ্ঠে সম্মার্জনী প্রয়োগ করিত। ভূত "বাপ্‌রে" "মাগো" বলিতে বলিতে কহিত, "ও কি কর, রত্ন, ও কি কর?" রত্ন বলিত, "ভূত ঝাড়ি।" রত্ন চেঁচামেচি করিব বলিয়া ভয় দেখাইলে ভূত তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে আসিত। অমনি "সাবধান, গা ছুঁয়োনা!" বলিয়া রত্ন ঝাঁটার চোটে ভূত ভাগাইয়া দিত। সে একাই চারি জন কার্ত্তিকের বল ধরে। তাই কাহাকেও কিছু বলিল না। কার্ত্তিকের মত লায়েক লোক সহজে নিরস্ত হয় না। তাহা দেখিয়া রত্ন বলিল, "শোন বাবু, আমি কালী কৈবর্ত্তের মেয়ে, কেউ আমার কলঙ্ক রটাতে পার্‌বে না। তুমি ভদ্র লোকের ছেলে বলিয়া তোমার মানইজ্জৎ বজায় রাখ্‌তে এতদিন কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু সাবধান, নিজের মুখে চুণকালি দিও না।" তবু কার্ত্তিক প্রতি রাত্রে উৎপাত করিতে লাগিল। ঘুমাইবার সময় ঘুম হয় না, তাড়াইয়া দিলে ফিরে ফিরে আসে। রত্ন আর সহিতে না পারিয়া তাহার পিতার বন্ধু বলাই বাগ্দিকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। বলাই শুনিয়াই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে রত্নকে গোপনে এক পরামর্শ দিয়া বলিয়া গেল, "তুমি কিছু ভেবনা, মা! আজ থেকে ভূত তোমার আধ ক্রোশ দূরে থাক্‌বে।"

রাত্রে আবার পূর্ব্ববৎ উৎপাত। বেড়া ধরিয়া টানা, ক্রমাগত কাসি, অবশেষে 'রঁত্ন' 'রুঁত্ন' বলিয়া ডাকাডাকি। রত্ন বলিল, "আজ যে বড়ই বাড়াবাড়ি, রোজ রাতে আমায় মিছে কেন জ্বালাতে এস, বাবু?"

ভূত। নিজে নিয়ত জ্বল্‌ছি ব'লে, রত্ন!

রত্ন। কি চাও তুমি?

ভূত। দোর খুলে দাও, বল্‌ছি।

রত্ন। কেন? অমনি বল না।

ভূত। আগে খোল।

রত্ন। এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় আস্‌বে বাবু? ভদ্দর লোক, বড় লোক, জমিদারের ছেলে!

ভূত। তা' হ'লই বা,—খুলে দে।

রত্ন দ্বার খুলিয়া দিল। ভূত তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে না দেখিতে, তড়িতের মত রত্ন বাহিরে আসিয়া দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিল।

ভূত ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিতে লাগিল, "রত্ন, খোল্‌, দোর খোল্‌।"

বলাই অনুচ্চস্বরে বলিল, "খুল্‌ছি।" প্রকাশ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "রত্ন, রত্ন, কার্ত্তিক বাবু এখানে আছে? আমাদের খুবই দরকার।"

ভূত। (চুপে চুপে) রত্ন, চুপ কর্‌—আম'লো, হাসিস্‌ কেন?—বল্‌, বাবু এখানে আস্‌বেন কেন?

কার্ত্তিক বাড়ী বসিয়া একখানা হোমিওপ্যাথিক প্রথম শিক্ষা পুস্তকের সাহায্যে গ্রামের লোককে ঔষধপত্র দিত। সে ভাবিল, বলাই বোধহয় কোন কলেরা কেসে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। রত্ন কিছু বলে না, কেবল হাসে দেখিয়া কার্ত্তিক চাপা গলায় পুনরায় বলিল, "বল্‌, বাবু নেই।"

বলাই। ঐযে কার গলা শোনা যাচ্চে। রত্ন—রত্ন!

কার্ত্তিক। (চাপাগলায়) বল্‌,—ওটা ভূত,—বাবু নেই।

রত্ন। কে ?—বলাই কাকা ?—কা'কে খুঁজ্‌চো ?

বলাই। কার্ত্তিক বাবুকে।

কার্ত্তিক। (অনুচ্চকণ্ঠে) বাঁবু নেই ?—ভূঁত,—ভূঁত।

বলাই। রত্ন, তোর ঘরের মধ্যে 'ভূঁত, ভূঁত' করে কেরে ? চল্‌তো দেখি, কেমন ভূত।

ভূত মাচার নীচে লুকাইল। বলাই দ্বার খুলিয়া মাচার নীচ হইতে ভূতকে টানিয়া বাহির করিয়াই উত্তম মধ্যম দিতে লাগিল। বলিষ্ঠ বাগ্‌দির লাঠির চোটে ভূত বলিল,—"আমি ভূত নই, কার্ত্তিক বাবু।"

বলাই। তুমি এত রাত্রে এখানে কি মনে ক'রে বাবু ?—

কার্ত্তিক। তা—তা—বুঝ্‌লে কিনা, রত্নের পেটে ব্যথা হয়েছিল। আমি তাই ওষুধ দিতে এসেছি।

বলাই! তবে এই ভূতের মুখোষ কেন ? (প্রহার)

কার্ত্তিক। তা—তা বেকুবি করেছি।—বলাই আর মেরো না, এমন কর্ম্ম আর করিব না। বলাই—বলাই দা—

বলাই। তুমি লম্পট, মিথ্যাবাদী, ভদ্দরলোকের মুখোষে একটা পাঁঠা। রত্নের কেউ নেই ব'লে তুমি তার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ ? আমরা চাষা লোক, কিন্তু আমাদের অমন স্বভাব নয়। এমন পাঁঠাদের হাত থেকে স্ত্রীলোকের মান ইজ্জত বাঁচাতে বলাই বাগ্‌দির লাঠি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। (পুনঃ প্রহার)।

প্রহারের যাতনায় কার্ত্তিক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, আর স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতে পারে না। রত্ন বলিল, "বলাই কাকা, ওর ঢের সাজা হয়েছে। আর মেরো না,—মারা যাবে।"

বলাই কার্ত্তিককে আর প্রহার না করিয়া রত্নের পা জড়াইয়া ধরিতে বলিল। কার্ত্তিক তাহাই করিল।

বলাই বলিল, "রত্নকে বল্, মা!

কার্ত্তিক। মা!

বলাই। বল্, 'রত্ন আমার মা।'

কার্ত্তিক। রত্ন আমার মা।

তারপর পাষণ্ড নাকে কাণে খৎ দিলে বলাই তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

৩

কার্ত্তিকের অঙ্গে প্রহারের দাগ দেখিয়া তাহার মা বলিলেন, "কে তোকে এমন ক'রে মেরেছে?"

কার্ত্তিক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বলাই বাগ্‌দি।

তখনই বলাইকে ধরিয়া আনা হইল। তাহার মুখে সকল ব্যাপার অবগত হইয়া জমিদার মহাশয় বলাইকে বিদায় দিয়া পুত্রকে বলিলেন, "তোর যেমন দুর্ম্মতি, তেমনি উচিত সাজা হয়েছে।"

কার্ত্তিকের মা কিন্তু কর্ত্তার বিচারে তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলাই ও রত্নের উপর প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তবে বলাইয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। কারণ, বাগ্‌দিরা দলে বেশী, ঐক্যবদ্ধ। উৎপীড়নের সম্পূর্ণ মাত্রা রত্নের উপরই পড়িল।

ইহার কয়েক মাস পরে বড় বৌ আবার বাড়ী আসিলেন। তিনি রত্নকে সঙ্গে লইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। বলাই বড়বৌএর প্রস্তাব সমর্থন করিলে রত্ন ভাইকে লইয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে কলিকাতায় গেল।

এখন সে বড়বৌএর ছেলেমেয়েদের ছোটমা। ছোটমা নইলে তাহাদের মোটেই চলে না। ছোটমাও তাহাদের প্রাণতুল্য ভালবাসে। রত্ন বড়বৌএর কাছে মাহিনা লওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার ভাইটিও তো ঠাকুরাণীর সংসারে মানুষ হইতেছে। বিশেষ, সে যে আর দাসী নয়,—ছোট মা!

কোটের উপর রিপু করা একখানা র‍্যাপার গায়ে দিয়া, তালি দেওয়া দুই বৎসরের নাগ্‌রা পায়ে দাঁড়াইত। অন্য সময়ে মৌতাতের জন্য পানের সঙ্গে ইদানীং কিছু 'কোকেন' খাইত, সন্ধ্যার সময় গোঁফে একটু আতর মাখিয়া মুজরা মাইফিলে মজা লুটিতে যাইত। হাকিম ও সাহেব দেখিলেই সে আভূমি সেলাম করিত। দারোগা-জমাদারের সঙ্গে খাতির মৌরাত রাখিত, "জি' 'হুজুর' 'সরকার' বলিয়া কথা কহিত। এঞ্জিনিয়ার বা 'পি. ডব্লিউ, ডি'র এস্. ডি. ও' তাহাকে 'ড্যাবি ডগ' বলিয়া গালি দিলে সে সেলামের পর সেলাম ঠুকিয়া আপনার অভাব দৈন্য জানাইত ও 'সততাই তাহার কাল' এই বলিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। মুরুব্বিরা তুষ্ট হইয়া এমন 'অনেষ্ট' ঠিকাদারকে বেশী বেশী ঠিকা দিতে লাগিলেন। মাধো তাহার 'সততার' বলে (?) অবিলম্বে 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ' হইল।

আয় খুব, অথচ ঘরে বাহিরে কর্ত্তাগৃহিণী উভয়েই বেশ হুঁসিয়ার, পাকা বিষয়ী, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টি, ভোজনের বা বেশভূষার পারিপাট্য নাই, অধিক ব্যয়সাপেক্ষ সখ্‌ নাই, বাবুয়ানি নাই, আত্মীয় কুটুম্ব পালনের 'বখেড়া' নাই, ভদ্রতার অনুরোধে নিমন্ত্রণে গেলেও, কাহাকেও পাল্‌টে খাওয়াইবার ঝঞ্ঝাট নাই, কার্পণ্য মজ্জাগত,—ভাঙ্গা হাঁড়িগুলি ও দেশালাইয়ের দগ্ধাবশিষ্ট কাটিগুলিও সযত্নে রক্ষিত,—টাকা মজুত না হইবে কেন? মাধোদাস শীঘ্রই বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন 'বড় লোক' বলিয়া পরিগণিত হইল।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মাধোর অর্থ আরও বাড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভুবনেশ্বরী বিধবা হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার মানসে ভ্রাতার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বামী অতিশয় দুর্দ্দান্ত ঘুষখোর দারোগা ছিলেন। এখন ভগ্নীপতির অগাধ টাকা দিদির হাতে পড়িয়াছে ভাবিয়া মাধো অবলীলাক্রমে তাঁহাকে আশ্রয় দিল ও ভাগিনেয় শ্রীকান্তকে কলিকাতায় 'টাইপ রাইটিং' শিখিতে পাঠাইল। বলা বাহুল্য, শ্রীকান্তের সকল ব্যয় দিদিই বহন করিতেন।

ইহার মাস কয়েক পরে ভুবনেশ্বরীর কঠিন পীড়া হইল। কালব্যাধি বুঝিয়া তিনি পুত্রকে তারযোগে সংবাদ দিয়া নিকটে আনিলেন ও মৃত্যুর পূর্ব্বে সঙ্গোপনে বলিয়া গেলেন, "লক্ষ টাকার মোহর আমি কলসীর মধ্যে পূরিয়া এই বাড়ীর পশ্চাতে আম বাগানের অন্তরালে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে পুতিয়া রাখিয়াছি। উহা তোমার। কেহ কিছু টের না পায় এমন ভাবে চলিও। হিসাব মত খরচ পত্র করিয়া চলিলে তোমাকে কোনও কষ্ট পাইতে হইবে না। এই টাকা ছাড়া তোমার মামার কাছে আমি নগদ দেড় হাজার টাকা রাখিয়াছি। তাহা হইতে অনুমান দুই শত টাকা ব্যয় হইয়াছে, বাকি তেরশ প্রয়োজন মত তাহার নিকট হইতে লইবে। আমি চলিলাম। তুমি সুখী হও, দীর্ঘায়ুঃ হও, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি।"

মাতার মৃত্যুর পর শ্রীকান্ত নিস্তব্ধ নিশীথে আমবাগানে কোদালি লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। কলসী বা মোহর কিছুই পাইল না। সে বুঝিল, মা মৃত্যুশয্যায় কখনও মিথ্যা বলেন নাই, মামাই তাহার লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

মোহরের কথা তুলিতেই মাধো দাস বলিল, "এ বেকুবটা দেখিতেছি

মাতৃশোকে একেবারে দেওয়ানা হইয়া গিয়াছে। হায়! হায়! এত করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া শেষে ছেলেটার 'দেমাক্' খারাপ হইয়া গেল!" উপযুক্ত মাতুল প্রতিবেশীদিগের নিকটে সালঙ্কারে এ কথা জ্ঞাপন করিল।

নিরুপায় হইয়া শ্রীকান্ত বলিল, "তবে মার নগদ দেড় হাজার টাকার মধ্যে আমার প্রাপ্য তের শ টাকাই দিন্।"

মাধো। (রাগতঃ হইয়া) তোমার হিসাবনিকাশের জ্ঞান মোটেই নাই, দেখিতেছি। দিদির খাই খরচ নাই ধরিলাম, তোমার কলিকাতার ব্যয় তিন শ টাকা, দিদির চিকিৎসার ব্যয় (?) এক শ, শ্রাদ্ধের ব্যয় তিন শ, বাকি আট শ শিবমন্দিরের জন্য। এই লও তোমার মার দেড় হাজার টাকার হিসাব।

শ্রী। মা তো মন্দিরের কথা কিছু ব'লে যান'নি!

মা। তোমাকে বলেন নাই, আমাকে বলে গেছেন।

শ্রী। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া) তবে ঐ আটশ'ই আমাকে ধার দিন্। যতদিন চাকরি বাকরির সুবিধা না হয়, ঐ টাকা হ'তে চালাব। পরে ধীরে ধীরে উহা শোধ করিব।

মা। সেকি?—দেবমন্দিরের টাকা আমি কাউকে ধার দিতে পারিব না। শেষে পাতকভাগী হব?

শ্রী। (সক্রোধে) যে পাতক করেছেন তার উপর এতে এমন বেশী কিছু হবে না।

মা। (অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তিতে) বেতমিজ, বেয়াদব, নেকালো ঘর্‌সে।

শ্রীকান্ত অনেক উকীল বাড়ী ঘুরিল, কোথাও কেহ ভরসা দিল না, —কারণ, প্রমাণাভাব।

বেগতিক দেখিয়া শ্রীকান্ত মামার কাছে ফিরিয়া আসিল। মাধোদাস তাহার সহিত বাক্যালাপও করিলনা।

কিয়ৎক্ষণ পরে দারোগা রহিম খাঁ শ্রীকান্তের নিকট সশরীরে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার নাম?" শ্রীকান্ত তাহার পূরা নাম বলিল। দারোগা আবার জিজ্ঞাসিল, "বাড়ী?—থানা?" শ্রীকান্ত ঠিক ঠিক উত্তর দিল।

দা। উপজীবিকা?

শ্রী। এতদিন মা চালাইতেন, উপস্থিত মামার অন্নে দিনপাত।

দা। হুঁ,—কোথা হইতে আসা হইয়াছে?

শ্রী। কলিকাতা হইতে।

দা। বটে?—তালতলায় বোমা ফাটার পর?

শ্রী। উহার কিছুই আমি জানি না।

দা। বড়া হুঁসিয়ার! ভাল চাও, ঠিক ঠিক বলিয়া যাও।

দারোগা সব কথা নোট্ করিয়া যাইতে লাগিল।

"যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী" বলিয়া সেই দিনই পঞ্জাব মেলে শ্রীকান্ত কাহাকেও না বলিয়া কলিকাতা রওনা হইল।

দারোগা মাধো দাসের নিকট 'পান খাইবার জন্য' কিছু পাইয়া সহাস্যে বলিল, "দেখিলে ইলিম! তবু আমাদের কদর কই? বাঙ্গালী ছোক্‌রা—তায় চাকরি বাকরি নাই। আর যাবে কোথায়?—দেখিলে

কার্‌সাজি,—কেমন চট্‌পট্‌ সরিয়া পড়িল। সে এদিকে আর ভুলিয়াও আসিবেনা।

মা। খাঁ সাহেবের মেহেরবাণী বান্দার উপর যথেষ্ট। কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল বাঙ্গালী ছোক্‌রা এসে জুটেছিল,—বেশ সরিয়ে দেওয়া গেছে। বুঝেছেন, এখন দিন কাল ভাল নয়।

দা। বেসক্‌,—কিন্তু ছোক্‌রাটা বেয়ান করিল, আপনি তার মামু।

মা। দূর সম্পর্কে বটে। আমার তা' ইয়াদ ছিল না। বাঙ্গালার সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ মিটিয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ মাধোদাস বাঙ্গালী নই বলিয়া সাহেবমহলে ও বন্ধুমহলে বড়াই করিত। সে না মাধবদাস, না রামদাস,—খাঁটি মাধোদাস। তবে বাঙ্গালী কেহ এঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়র হইয়া আসিলে সে অবশ্য বাঙ্গালী বলিয়া গৌরব করিত।

সুখবতীয়া স্বামীর চক্রান্তে সাফল্যের কথা অবগত হইয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল, "বেহতর্‌, বেহতর্‌!" কিছুদিন কাটিয়া গেলে সে পতিকে ধরিয়া বসিল, একটা বড় গোছের পাকা ইমারৎ করা দরকার। মাধোর তাহাতে মহা আপত্তি। সে বলিল, "এই বাড়ী হ'তেই আমার ধন দৌলত যা কিছু। এ বাড়ী ছাড়িব না।"

সু। তবে এই বাড়ীই তব্‌দিল ক'রে দাও। বসিবার একটা 'হল্‌' কর, কলিকাতা হইতে কার্পেট ও রকমারি আসবাব পত্র আনাও, জুড়ি গাড়ী কর। ঈশ্বরের ইচ্ছায় টাকার অভাব নাই। এখন মান ইজ্জত্‌ যাহাতে বাড়ে তাহাই করিতে হয়।

স্বামিস্ত্রীতে বহুক্ষণ গোপনে পরামর্শ হইল। সকল ক্ষেত্রে যাহা

হইয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই অর্থাৎ স্ত্রীরই জয় হইল। শেষ বয়সে একটা নাম রাখিয়া যাইতে মাধো বদ্ধপরিকর।

নিজেদের বড় বাড়ী হইল। সঙ্গে সঙ্গে হেনা বিবিরও একটা বাড়ী হইয়া গেল। যুবতী পিয়ারীকে ছাড়িয়া দিয়া মাধো প্রৌঢ়া হেনা বিবির প্রেমে ইদানীং বড়ই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে বলে, উহার মূলে বিবি সাহেবার সম্পত্তি। যে যা' খুসী বলুক, "কি করে লোকেরি কথায়?"

ইহার পর মাধোদাস একটা বড় চাল চালিল। সে সহরের পূতিগন্ধময় বস্তিগুলির সংস্কারে বা পানীয় জলের সুব্যবস্থায় মন না দিয়া হঠাৎ সাহেব কোয়ার্টারে "বিজলী বাতির" প্রবর্ত্তনে পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া ফেলিল। তারপর কালেক্টর ও কমিশনর সাহেবকে ঘন ঘন পার্টি দিতে লাগিল। ইহাতে আশানুরূপ ফলও ফলিল। মাধোদাস মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অভিষিক্ত হইল। ক্রমে 'অনেষ্ট' ও বদান্য ঠিকাদার বলিয়া তাহার নামের সহিত 'রায় বাহাদুর' খেতাব জুড়িয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টে প্রস্তাব গেল। যথাসময়ে মাধোদাস সেই উপাধিতে ভূষিত হইয়া মানবজন্ম সফল করিল। কুলোকে রটাইল, তার মত নরাধমও যে পার্টি ও বিজলী বাতীর ব'ড়ের চালে রায় বাহাদুরির কিস্তি মাৎ করিল ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের কথা। তবু চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। বদান্যের অগ্রগণ্য মাধোদাস রায় বাহাদুরের বাড়ীতে গণ্য মান্য ও নগণ্য লোকের ভিড় অসামান্য। সপ্তাহকাল ধরিয়া 'রামলীলা' হইল, তিন দিন তিন রাত 'মুজরা' হইল,

কলিকাতা হইতে ইহুদী নর্ত্তকী আসিয়া সাহেব বিবিদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া গেল।

লোকমুখে কেবলই "রায় বাহাদুরকী জয়" ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সুখবতীয়া বলিল, "কেমন দেখ্‌লে, আমার কথা শুনে ভাল না মন্দ হ'ল?"

মা। সবই সীতারামের ইচ্ছা!

মাধোদাসের বন্ধুরা কহিল, "মাধোয়াকা তগ্‌দির বড়া চমক গিয়া রে!"

দুই বন্ধু।

আজ সকাল বেলাই দ্বিপ্রহর। বাতাসের দেখা নাই। তপ্ত তাম্র-কটাহের ন্যায় রক্তরবি সাহেবগঞ্জের গিরিগাত্রে অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে। সম্মুখে সাবই ঘাসের জঙ্গল। তাহার পার্শ্বে অতি বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তর। শূন্যে একটি দলচ্যুত শকুনি দীর্ঘপক্ষ বিস্তার করিয়া উপোষিতনেত্রে শবের সন্ধানে উড়িতেছিল।

নলিনের মনে হইতেছিল, আজ শিকারে আসিয়া ভাল করে নাই। একটা বন্যশূকরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সে সঙ্গী ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। শূকর মারা দূরের কথা, পাহাড় হইতে পিছলাইয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়াছে। দৈবে আঘাত গুরুতর হয় নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল ছুটাছুটি করিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। পায়ের যন্ত্রণায় হাঁটিতেও পারিতেছে না। শুষ্ককণ্ঠে অনেকক্ষণ ব্যর্থ চীৎকারের পর সে আর কাহাকে ডাকিতেও পারে না। তাহার কেবল মনে হইতেছিল, সে আজ ঐ সাবই ঘাসের জঙ্গলে শকুনিটার আহারে পরিণত হইবে।

অভাগার মাথা পূর্ব্ব হইতেই ঘুরিতেছিল। ক্লান্তি, অনাহার, একা সায়াহ্নের প্রাক্কালে অরণ্যবাস, দুশ্চিন্তা তাহাকে যুগপৎ উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে কখনও ভাবিতে পারে নাই আজ সাহেবগঞ্জের সাবই ঘাসের ভিতর তাহার মূল্যবান্ জীবনের যবনিকা পতন হইবে।

নলিনের মাথা আরও বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এমন সময়ে তাহার বন্ধু সুরেশ দুইটি আর্দ্দালির সহিত তাহার আশে পাশে তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। নলিনের তখন সাড়া দিবার শক্তি নাই। সে সংজ্ঞাহীন শবের মত পড়িয়া ছিল। অনুসন্ধানকারীরা তাহাকে না পাইয়া চলিয়া গেলে নলিনের অস্পষ্ট ভাবে মনে হইতে লাগিল, শূকরটা প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহার চারিদিক শুঁকিয়া গেল।

ধীরে ধীরে নলিনের মনে প্রেমবিহ্বলা স্ত্রী ক্যাথারাইনের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল। না জানি তিনি তাহার জন্য কতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কত উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিতেছেন।

নলিনের মনে পড়িল, ক্যাথারাইন তাহাকে কত ভালবাসে! বোর্ডিংএ প্রথম মিলনের দিন হইতে লজ্জানতমুখীর প্রেমাভিনয়পর্ব্ব, তার পর সেই স্মরিতে শিহরে, জন্মসফল করা, সুধামাখা 'ইয়েস্' টুকু, পরিণয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার বিজয়,—একে একে সব কথা নলিনের মনে পড়িতে লাগিল। আনন্দে, গর্ব্বে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

সাহেবগঞ্জে ক্যাথারাইনের এক পিসতুত ভাই রেলওয়েতে কাজ করে। তাই ঈষ্টারের ছুটিটা পত্নীর অনুরোধে নলিন সেখানে কাটাইতেছিল। একটা বাংলা সে, ক্যাথারাইন ও সুরেশ অধিকার করিয়া ছিল। প্রিয় বন্ধুকে ছাড়িয়া নলিন কোথাও যাইত না। দুজনায় এত মিল যে ক্ষণিকের বিচ্ছেদ কেহ সহিতে পারিত না। বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কি বিলাতে, কি স্বদেশে সর্ব্বদা তাহারা যুগলে বিরাজ করিত। তাই ক্যাথ্যারাইন তাহাদিগকে "the two Kings of Brentford" বলিয়া ঠাট্টা করিত। সুরেশও এক দিন উক্ত সুন্দরীর পরিণয়প্রার্থী

ছিল। কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নলিনের জিত্ হয়। তাহাতে সুরেশের ভগ্নহৃদয় হইয়া হঠাৎ পিস্তল দিয়া আপনার মগজ উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা কোন দিন হয় নাই। বরং ঐ সুন্দরীর মনোরঞ্জনার্থে সে সময়ে অসময়ে 'ব্যাঞ্জো' বাজাইত,--কারণ ক্যাথারাইন তাহার 'ব্যাঞ্জো' শুনিতে বড় ভালবাসিত। পূর্ব্বে যেমন সে বন্ধুর সহিত সর্ব্বদা কাটাইত, এখনও তেমনি কাটায়। ক্ষোভের লেশও নাই। তবে আজ পর্য্যন্ত সে অবিবাহিত।

সারাদিন শ্রান্তি ক্লান্তি। নলিন পূর্ব্ব স্মৃতির তর তর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ঘোরে স্বপ্নে দেখিল,—সে যেন কোন্ সুদূর লোকে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে সুখ অনন্ত, শান্তি অনন্ত। সেখানে অনন্ত অবাধ জ্যোৎস্না, বিরামহীন, মৃত্যুহীন। সেই চিরজ্যোৎস্নাস্নাত রাজ্যে একটি সুন্দর উপবন, তাহার স্থানে স্থানে রম্যকুঞ্জ, অমৃত প্রস্রবণ,—কুঞ্জে কুঞ্জে পিককুল মুহুর্মুহুঃ কুহু কুহু ডাকিতেছে, প্রস্রবণে প্রস্রবণে রাজহংস সগৌরবে গ্রীবা বক্র করিয়া সন্তরণ করিতেছে,—মধ্যে একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা, অপূর্ব্ব চিত্রশোভিত, মহামূল্য তিরস্করিণীরঞ্জিত, উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকোদ্ভাসিত। সেই অট্টালিকায় দুইটি মাত্র প্রাণী,—ক্যাথারাইন ও সুরেশ। সুরেশ ব্যাঞ্জো বাজাইতেছে, ক্যাথারাইন আপনহারা হইয়া শুনিতেছে। তার পর ক্যাথারাইন গায়িল, শিরায় শিরায় তাড়িতপ্রবাহবাহী উন্মাদনাময় সে প্রেমসঙ্গীত। গায়িকার অশ্রুত-পূর্ব্ব কোমল কণ্ঠস্বরে সুর মিলাইয়া সুরেশ সেই নৈরাশ্য বিষাদে গ্রথিত অপূর্ব্ব সঙ্গীত গায়িল। হতাশপ্রণয়ের কোমল পদাবলী লুটিয়া লুটিয়া ক্যাথারাইনের হৃদয়বেলায় আঘাত করিল, ক্যাথারাইন শিহরিয়া

উঠিল,—তার পর, সেই রূপসী তাহার বহুকাল সঞ্চিত রুদ্ধপ্রণয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রেমাবেশে সুরেশকে কোমল বাহুবল্লরী দ্বারা দৃঢ়াশ্লেষ-বদ্ধ করিয়া চুম্বন গ্রহণোন্মুখ অধরে অধর রাখিয়া কহিল, "আমি তোমারই—আমি তোমারই।" নলিনের ধমনীতে ধমনীতে আগুনের ঝলকা ছুটিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—"কখনই নয়।" ক্রোধে তাহার ওষ্ঠ স্ফুরিত হইল, নয়ন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল, মাথার সহিত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল। সে চক্ষে সব অন্ধকার দেখিল।

এমন সময়ে নিদ্রাবস্থায় উঠিয়া বসিয়া নলিন দেখিল একজন আর্দ্দালি, সুরেশ ও ক্যাথারাইন তাহার দিকে আসিতেছে। তখন তাহার যেটুকু জ্ঞান ছিল তাহাও গেল। বস্তুতঃ, রমণী ক্যাথারাইন নন, ক্যাথারাইনের ভ্রাতার বাগ্‌দত্তা, নার্স। সুরেশ নিকটে আসিতেই নলিন তীব্র বিদ্রূপের সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "পরম বন্ধু, দুজনায় মিলে আমাকে জ্যান্তে গোর দিতে এসেছ?"

সুন্দরী সযত্নে নলিনের অঙ্গের আঘাত দেখিতে লাগিলেন। নলিন সজোরে তাঁহার হাত সরাইয়া দিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লইল। কহিল, "অবিশ্বাসিনি!"

সুরেশ অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বলিল, "দেখুন, নলিনের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই তো?"

রমণী। (চাপা গলায়) কিছুমাত্র না।

সু। তবে 'ডিলিরিয়ামে' এলো মেলো বক্‌চে যে?

র। ও কিছু নয়।

নলিন। বটে?

"প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার.
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাই আর !"

সুরেশ। নলিন, নলিন, এখন কিছু ভাল বোধ করিতেছ কি ?

নলিন। (ব্যঙ্গভরে) খুব ভাল।

নলিন তাহার রিভলভারটা হাতড়াইয়া খুঁজিতেছিল। কিন্তু পাইল না। নিষ্ফলরোষে আরও জ্বলিতে লাগিল। কহিল, "সুরেশ, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক !" লজ্জায়, অপমানে, অভিমানে সুরেশের চক্ষু অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, নলিনের হৃদয়ে তাহার প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস ঢুকিয়াছে।

এমন সময়ে ক্যাথারাইনের পিস্‌তুত ভাই সুরেশের আর্দালির সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হ্যালো, 'সিরিয়াস্' নয় তো ?"

রমণী। একেবারেই না। (সুরেশের প্রতি) ওঁকে কিছু খাইতে দিন।

এ কার কণ্ঠস্বর ! কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া মুখ ফিরাইতেই নলিন দেখিল, রমণী নার্স্ মড্।

নলিন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া সুরেশের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু সেই রাত্রিকার ট্রেণেই সুরেশ "গুড্‌বাই নলিন !" বলিয়া চিরবিদায় লইল।

শুনিয়াছি, ইহার পর হইতে সুরেশের হাইকোর্টে পশার বাড়িয়াছে, সে ব্যাঞ্জো ছাড়িয়া দিয়াছে, তবে বিবাহ করে নাই।

পায়ের পয়জার।

১

দুর্গাদাস দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিয়াছে। পত্নী সুভাষিণী পরমা সুন্দরী। তাহার রূপ অঙ্গ ছাপাইয়া পড়িতেছে, নয়নে ধরে না। বালিকার অপূর্ণ চারুতার সহিত যুবতীর উচ্ছলিত সৌন্দর্য্যের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম, ফোটে ফোটে ফোটে না ফুলের সহিত ফুল্ল কুসুমের মাধুরী। মরি মরি, শারদজ্যোৎস্না যেন বসন্তের রাণীকে আলিঙ্গন করিতেছে! মুগ্ধ দুর্গাদাস শীঘ্রই প্রেমদাসে পরিণত হইল,—অথবা, কামরূপে গেলে যাহা হইবার ভয় সে কলিকাতায় থাকিয়াও তাহাই হইল।

দুর্গাদাস নিতান্ত গো-বেচারা, মাটীর মানুষ, কাহাকে উঁচু করিয়া কথা কয় না। সে মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ করিয়া গড়ে মাসিক প্রায় ৬০৲ টাকা উপার্জ্জন করে। ঘরে প্রেয়সীকে, বাহিরে আফিসের সম্বন্ধীকে খুসী করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়, কাহারও নিন্দা চর্চ্চার বা রাজনীতি, সমাজনীতি পর্য্যালোচনার তোয়াক্কা রাখে না। সে রূপসী ভার্য্যার নিমকের নফর, তুকির বান্দা,—শ্রীমতীর আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে, অনাদিষ্ট মান ভঞ্জন করে। প্রিয়তমার মান ভাঙ্গিতে ও সাহেবের মন যোগাইতে বেচারা প্রাণান্ত। তবে দক্ষতার সহিত কাজ করিলে 'প্রোমোসন' হয়। দুর্গাদাস গৃহিণীর নিকট পাইল প্রেমে

'প্রোমোসন, সাহেবের নিকট পাইল চাকরিতে 'প্রোমোসন'। কিন্তু তাহার কাজ বাড়িয়া গিয়াছে।

২

দুর্গাদাসের মা হরসুন্দরী বৃদ্ধা। বৃদ্ধবয়সে বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে, অসহিষ্ণুতা বাড়ে। তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। নববধূর কর্ত্তৃত্বস্পৃহায় বাধা দেওয়া অসঙ্গত, বেজায় বে-আইনি, ইহা তাঁহার জানা না থাকায় ও তাঁহার বেয়াদবি পরিপাক করিবার শক্তি না থাকায় হরসুন্দরী বিপদে পড়িলেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্র ও পুত্রবধূর অস্নেহ ও অত্যাচার কেন, কোন জিনিষই ভাল পরিপাক হয় না।

বিবাদে বধূ পঞ্চমুখ। বচসায় তাহার চন্দ্রবদন মেঘে ঢাকে, নয়নে বিদ্যুৎ খেলে, পরে গর্জ্জনে বর্ষণে বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠে। 'ওগো আমার কপালে কি শেষে এই ছিল গো' যাই বলা, হরিদাস বুঝিত 'তদা ন শংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'। কারণ, সুন্দরী প্রেয়সীর রোদন কোন কালেই অরণ্যে রোদনে পরিণত হয় না। শাশুড়ী বধূতে আজ কাল অহিনকুলের সম্বন্ধ বাড়িয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান বধূরা সেকালের বধূদের মত নিতান্ত অবনতমুখী মূক কলাবধূ নয়, পতিসন্নিধানে তাহাদের স্বর প্রেমে গদগদ হইলেও যে অন্যের নিকট উহা বাজখাঁইয়ে পরিণত হয়, দুর্গাদাস তাহা না জানিত এমন নয়। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে যে এত শীঘ্র সংসারসাগরে তুফান উঠিবে তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সকালে আফিসে যাইবার পূর্ব্বে, তার পর আফিস হইতে আসিবার পরও কোন্দল-কলহ তাহার আদৌ ভাল লাগিত না।

এমন অবস্থায় দোটানায় পড়িয়া সকল প্রেমদাস যাহা করিয়া থাকে দুর্গাদাসও তাহাই করিল।

নবীনা বাদিনী, বিচারকের শয্যাসঙ্গিনী, তেজস্বিনী, তাহার ভাষাও ওজস্বিনী। প্রবীণা, পুত্রসত্ত্বেও অবীরা, স্থবিরা, ধীরা, অপ্রখরা, মামলা দায়ের বা খাড়া করিতে অনিচ্ছুক,—সাফাইএ, সওয়ালে অপটু। কাজেই নবীনার পক্ষে এক তরফা ডিক্রি, প্রতি মামলায় জিত্, তবু বিধুবদনা বিষণ্নবদনা। হরসুন্দরীকে তাহার এলেকা হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে জিত্ হইল কৈ? সে একদিন পতিকে ধরিয়া বসিল, "আমাকে রাখিতে চাও তো তোমার মাকে এখান হইতে সরাও। নইলে চল্লুম আমি বাপের বাড়ী।"

দুর্গা। আহা-হা, এও কি হয়? তুমি গেলে আমি থাকৃবো কেমন ক'রে?

সুভা। উনি থাকৃলে আমি এখানে থাকৃব না। দিন রাত গাল খেয়ে এখানে চাট্টি খাব? এটুকু অন্নদান বাবাও কোর্ত্তে পারেন। (রোদন)

সুভাষিণীর পিত্রালয়ের গর্ব্ব খুবই ছিল। তাহার পিতা এক আফিসের বড় বাবু, দুর্গাদাস গরীব। বিবাহের পর ২।৩ বৎসর সুভার পিতা সুভাকে তাহার স্বামীর বাড়ীতে যাইতে দেন নাই। এবার প্রথম ঘর কন্না করিতে আসিয়া তাহার সহিত শাশুড়ীর বিরোধ উপস্থিত হইল।

এদিকে সুভার অশ্রুজলে দুর্গাদাসের হৃদয় গলিয়া গেল। বেচারা প্রেয়সীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া 'আহা', 'আহা' করিতে করিতে বলিল, "আচ্ছা—তা—কি কোর্ত্তে বল তুমি?"

সুভা। সে এমন শক্ত কথা নয়। তোমার মাকে মাস মাস কিছু মাসহরা দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেও, কি বৈদ্যনাথে পাঠিয়ে দেও,—কিম্বা আর যেখানে খুসী পাঠিয়ে দেও।

হরসুন্দরী আড়াল হইতে সব শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাকে তোমাদের কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে না, মাসহরাও দিতে হবে না। আমি আজই কালীঘাটে যাচ্ছি।"

কালীঘাটে হরসুন্দরীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ট্র্যামওয়েতে কাজ করেন। অভাগিনী মনে মনে সেই স্থানে আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন।

মার কথায় দুর্গাদাস না রাম না গঙ্গা কিছুই বলিল না। হরসুন্দরী অভিমান করিয়া গাড়ী ডাকাইয়া কালীঘাটে রওণা হইলেন। যাইবার সময় দুর্গাদাস বলিল, "তা' মা, তুমি নিজে রাগ ক'রে চ'লে যাচ্চ। আমি কি কোর্ব্ব বল ?"

যদি তখনও দুর্গাদাস একবার বলিত, "মা, তুমি যেওনা,—তোমায় যেতে দিব না!" তাহা হইলে হরসুন্দরীর অভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িত, তিনি পুত্রকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না। জগতে মার এক বিন্দু দুধের ধার কেহ শুধিতে পারে না, দুর্গাদাস অম্লানবদনে সেই মাকে উপেক্ষা করিল! প্রেমময়ী সুভাষিণীকে গৃহপিঞ্জরে ধরিয়া রাখিতেই সে উৎসুক। তাহার কাছে মা,—জগৎ তুচ্ছ। ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিতে গেলে মাথা ঘোরে। বিশেষ, দুর্গাদাসের ক্ষুদ্র মাথা আরো ঘোরে। কাজেই সে সকল স্ত্রৈণের ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করিল, অর্থাৎ, জননী ও প্রণয়িনীর এই প্রতিপত্তি-স্পর্দ্ধায় সে প্রণয়িনীর বিজয়ডঙ্কা বাজাইল।

৩

এতকাল শাশুড়ী রাঁধা বাড়া করিতেন, ঝি না আসিলে বাসন মাজিতেন। সুভাষিণীর কোন ভাবনা ছিল না। এখন একা গৃহস্থালী করিতে গিয়া সে বিষম দায়ে পড়িল। অবস্থায় কুলায় না। মাহিনা দিয়া ঠাকুর রাখা চলে না। নিজে রাঁধিতে হয়। ঝি মাগী বড় বজ্জাত, খামকা প্রায়ই কামাই হয়। সুভাষিণীর মধ্যে মধ্যে বাসনও মাজিতে হয়। গালি দিলে ঝি তাহা দুর্গাদাসের মত হজম করে না, বলে "খেটে খাই বলে তোমার গাল শুনবো কেন? মাইনে ফেল, চলে যাচ্চি এখুনি।" কি বিপদ! অগত্যা সুভাষিণী ঝিকে আর কিছু বলিত না।

একদিন কুটনা কুটিতে কুটিতে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া গেল,—সেই হইতে দুর্গাদাস কুটনাকুটা আরম্ভ করিয়া দিল; উনানে ফুঁ দিতে গেলে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়ে, দুর্গাদাসই উনান ধরায়,—ঝি বড় দেরীতে আসে; একদিন রাঁধিতে রাঁধিতে সুভাষিণী তাহার নরম মোলায়েম হাত পোড়াইয়া ফেলিল,—এবং তারপর হইতে রাঁধিতে গেলে প্রায়ই তাহার মাথা ধরিত,—অগত্যা দুর্গাদাসই নিত্য রাঁধিয়া বাড়িয়া আফিসে যাইতে লাগিল; আর, সুভাষিণী প্রত্যূষে বিছানা হইতে না উঠিতে চা খাইতে বড় ভালবাসে,—দুর্গাদাস সুবোধ বালকের মত রোজ শয্যাপার্শ্বে নিয়মিত সময়ে চা পেয়ালা লইয়া হাজির হয়! সুন্দরীর মাথা ধরিলে সে মাথা টিপিয়া দেয়, আলতা এসেন্স এগিয়ে দেয়, শাড়ী কুঁচিয়া রাখে। ব্রজেশ্বরের মত পা যে টিপিতে না হইত তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, দুর্গাদাস আফিসে ও বাড়ীতে এত খাটে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, সুভাষিণী ঠায়ে বসিয়া থাকিত। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দুর্গাদাস যখন তাহার দৈনন্দিন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত তখন সুভাষিণী মনোযোগ দিয়া উলের ফুল তৈয়ার করিত, নভেল পড়িত, খোঁপা বাঁধিত, অথবা, সুন্দর মুখের উপরে কালো কেশগুচ্ছ এলাইয়া দিয়া সগৌরবে সেই টুক্‌টুকে মুখখানি মুকুরে দেখিত,—যেন চিত্রি মেঘের ভিতর হইতে চাঁদ উঁকি দিতেছে! ইহা ছাড়া, দুর্গাদাসের আফিসের মাহিয়ানা ও উপরি পাওনা সুন্দরী নিজের খাস হেফাজতে রাখিত এবং প্রায়ই থিয়েটার, সার্কাস বা বায়োস্কোপ দেখিতে যাইত। তবু কেহ সন্দেহ করিতে পারেন সুভাষিণী কিছু করিত না?

কেবল সেবায় রমণীর মন ভুলে না,—গহনাও চাই। আয় অল্প, খরচে কুলায় না। সে ভাবনা প্রেয়সীর নয়। তুমি পুরুষ, গহনা গড়াও আর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ আর গড়াও,—তবে মানিনীর মন পাইবে। আর অলঙ্কারশিঞ্জিনী ও কনক-কিঙ্কিনী দিয়া চারু অঙ্গের চারু শোভা বাড়াইয়া যদি প্রেয়সীর প্রীতিপ্রফুল্ল চন্দ্রবদন না দেখিলে তবে কিসের তুমি প্রেমিক?

দুর্গাদাস অনন্যোপায় হইয়া গহনা গড়াইবার নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিল। তাহা,—দাড়ি রাখা। এ পন্থা সুভাষিণীর মনঃপূত হইল না। সে বলিল, "মরণ আর কি, নাপিতের খরচ বাঁচাইয়া সোনার দাম কতই জুট্‌বে?"

দুর্গা। বুক পর্য্যন্ত রাখিলে দুই ভরি, নাই পর্য্যন্ত নামিলে এক জোড়া স্প্রীংয়ের বালা!

সুভা। খেপেছ? এখুনি দাড়ি কামিয়ে ফেল বল্‌চি। নইলে, দাড়ি নিয়ে আমার পানে মুখ বাড়াতে দেব না।

দুর্গা। তা—তা—কিন্তু—

সুভা। এতে কিন্তু টিন্তু নেই। গহনার টাকা জোটাবার অন্যপথ দেখ।

"তাই করিব" বলিয়া দুর্গাদাস অর্থ উপার্জ্জনের অন্য ব্যবস্থায় মন দিল। তাহা কি যথাসময়ে বলা যাইবে।

৪

এদিকে আফিসে সাহেবের পায়ের পয়জার, বাড়ীতে প্রেয়সীর পায়ের পয়জার। ডবল চোট সামলাইতে না পারিয়া অবিরত পরিশ্রমে দুর্গাদাসের পীড়া হইল।

এখন সুভাষিণীর রান্না করিয়া খাইতে হয়, রোগীর পথ্য যোগাইতে হয়। তাহার মেজাজ কড়া হইল, রুক্ষতা বাড়িল। সে খাটিতে খাটিতে খিট্‌খিটে হইয়া একদিন স্বামীকে স্পষ্ট বলিল, "আমি তোমার দাসী নই যে দিন রাত গাধাখাটুনি খাট্‌ব। এ খাটুনি আমার আর সইবে না।"

দুর্গা। তা' বড় কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তুমি না করিলে কে কোর্ব্বে বল? মা নেই যে সেবা যত্ন কর্‌বেন।

সুভাষিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আন্‌লেই পার। আমি তো বল্‌চি না, 'ওগো এনো না গো এনো না।' তুমি তোমার মাকেই আন, চল্লুম আমি বাপের বাড়ী।"

দুর্গা। আহা, আমি বিছানায় প'ড়ে থাকায় তুমি বড়ই কষ্টে পড়েছ।

সুভা। না, বড়ই সুখে আছি।

দুর্গা। রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি!

সুভা। সব সময় ঐ এক কথা, আমি সারাদিন রেগেই থাকি! কাজ করে এসে পাড়াপড়সী, রান্নাবান্না ক'রে, ঠাকুরসেবা করে তা'রা।

দুর্গা। (রুদ্ধ হৃদয়ভাব মুক্ত করিয়া) স্ত্রী তুমি,—সম্পদে সুখ, বিপদে সহায়। তুমি করিবে না?

সুভা। কি, দাবী আর কি? "বটে?—ঝি, ঝি, পোড়ারমুখী!

দুর্গা। (মনে মনে) সমান ঘরে বিয়ে না হ'লে এই রকমই হয়। (প্রকাশ্যে) দাবী আছে সুভা! স্বামী আমি, তুমি বড় লোকের মেয়ে হলেও তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ দাবী আছে।

সুভা। তাই নাকি?—ঝি, অ-ঝি!

ঝি আসিলে সুভাষিণী তাহাকে গাড়ী ডাকিতে বলিল। গাড়ী আসিবামাত্র সুভাষিণী ঝির সহিত তাহাতে উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাস ভাবিতে পারে নাই, তাহার স্ত্রী তাহাকে রুগ্নশয্যায় ফেলিয়া যাইবে। এখন তাহার জ্বর না থাকিলেও সে আজও অন্নপথ্য করে নাই। সুভাষিণীর কাণ্ড দেখিয়া বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল, "সুভা, আমি আবেগে একটা কথা ব'লে ফেলেছি। তাইতে কি রাগ কোর্ত্তে আছে। এস ফিরে,—এস ফিরে এস গো!"

সুভাষিণী আসিল না। সে সংক্ষেপে গাড়োয়ানকে বলিল, "হাঁকাও।"

গাড়োয়ান। কাঁহা যানে হোগা মায়ি?

সুভা। মাণিকতলা।

সুভার পিতা মাণিকতলায় থাকিতেন।

দুর্গাদাস জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, "ওগো,

যেওনা গো, যেও না,—মাথা খাও, পায়ে পড়ি, কথা রাখ, যেওনা ! ঝি, ও ঝি, ওকে একবার ফেরানা ঝি !"

গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিল। তাহা যেন দুর্গাদাসের হৃদ্‌পিঞ্জরের ভিতরে আঘাত করিল।

গাড়ী গড় গড় করিয়া চলিয়া গেলেও দুর্গাদাস ডাকিতে লাগিল, "ওগো যেও না গো, যেও না !"

সেই করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া একটি স্কুল পলাতক ফচ্‌কে ছোঁড়া ব্যঙ্গ করিয়া গায়িতে গায়িতে গেল,—

"ওগো, কাঁদায়ে আমারে যেওনা,
তুমি গেলে প্রাণ আর রবে না,
কাঁদায়ে আমারে যেও না।"

৫

সুভাষিণীর প্রতি দুর্গাদাসের ঘৃণা জন্মিল। কিন্তু হৃদয়ে ঘৃণা জাগিতে না জাগিতে তাহাতে প্রেয়সীর রমণীয় মুখচ্ছবি চিত্রিত হইল। অতএব দুর্গাদাস সারিয়া উঠিয়া পত্নীকে আনিতে গেল। খাটুনির ভয়েই হোক্ বা দুর্জ্জয় অভিমানবশতঃই হোক্ সুভষিণী আসিল না।

ইহার পর অভাগা আবার শ্বশুরালয়ে গেল।

অনেক সাধাসাধির পর সুভাষিণী আসিল। দুর্গাদাস পূর্ব্ববৎ রাঁধা-বাড়া, আফিসের কাজ, মান্ ভাঙ্গা, প্রভৃতি সব করিতে লাগিল।

এখন হইতে সে আড়ে হাতে সঙ্গোপনে প্রেয়সীর গহনা গড়াইবার যোগাড় করিতে লাগিল। যেমন করিয়াই হোক্, সুভাষিণীকে খুস করিতে হইবে।

সে দেখিল, আফিসের চাকরিতে তেমন লাভের প্রত্যাশা নাই, কিন্তু টাকা জাল করিলে রাতারাতি টাকা বাড়িয়া যায়। তাই সে মেকি টাকা তৈয়ার করিতে ওস্তাদ এক পাকা বদমাইসের সহকারীর কার্য্য করিতে লাগিল। সুভাষিণীর কয়েকখানা গহনা হইল। তবে, কোন পাপই বেশী দিন গোপন থাকে না। কাজেই দুর্গাদাসের জালিয়াতিও একদিন ধরা পড়িল। ধরা পড়িয়া সে দেখিল, হিন্দুস্থানী সান্ত্রীর দৃঢ় করস্পর্শে ও সুভাষিণীর কোমল স্পর্শে প্রভেদ বিস্তর। আর কোথায় লাল পাগড়ীর কর্কশকণ্ঠ,—গৌড় সারেং মেঘমল্লার দীপক, কোথায় সুভাষিণীর সুস্বরলহরী,—ললিত বিভাস ভৈরবী!

আহা, অভাগার আশা কেবল মুঞ্জরিতেছিল,—ফলবতী হইতে সময় পাইল না। দুর্গাদাস জনৈক বন্ধুর কাছে তাহার জালিয়াতি হইতে লব্ধ সহস্র টাকা জমা রাখিয়াছিল। হাতে হাতকড়ি পড়িতেই সে ঐ টাকা ব্যয় করিয়া পুলিসকে করায়ত্ত করিল। টাকা জাল করা সঙ্গীন অপরাধ। তবে তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ কিছু নাই। কয়েকদিন হাজত ভোগের পর হতভাগ্য জামিনে খালাস পাইল। কিন্তু তদন্তকারী দারোগা ছাড়িয়া দিলেও বড় সাহেবের আদেশে তাহার নামেও মকদ্দমা চলিল।

দুর্গাদাস মামলার খরচের জন্য সুভাষিণীকে ধরিয়া বসিল। সে সকাতরে বলিল, "সুভা, আমাকে বাঁচাও!"

সুভা। আমি কি ক'রে বাঁচাব? ছি, ছি, কেন এমন কাঁচা কাজ কর্‌তে গেলে?

দুর্গা। তোমারই জন্য সুভা!

সুভা। আমার জন্য টাকা জাল ক'রে তোমাকে জেলে যেতে বলেছিলাম?

দুর্গা। তা' বলনি। মতিভ্রংশ হয়েছিল। এখন আমায় রক্ষা করার উপায় কর।

সুভা। তুমি পুলিসকে হাজার টাকা ঘুষ দিলে কোথেকে? নিজের জন্য আরও কিছু না হয় ব্যয় কর।

দুর্গা। আর কপর্দ্দকও নাই। বন্ধুর কাছে হাজার টাকা তোমারই গহনা গড়াইবার জন্য রেখেছিলাম। সে টাকা প্রথমেই খরচ হয়ে গেছে। এখন আমি নিরুপায়।

সুভা। বন্ধুকে বিশ্বাস পেলে, আমায় তো কিছু বলনি। গহনার কথা মিথ্যা। ওটা তোমার অন্য খরচের স্বতন্ত্র তহবিল।

দুর্গা। সত্যই তা নয়। তোমায় একবারে এক সেট নূতন প্যাটার্ণের গহনা গড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই উহা বন্ধুর কাছে রেখেছিলাম। বাড়ীতে রাখিলে খরচ হবে ভয়ে এ কাজ করেছি।

সুভা। যাক্, না হয় তোমার কথাই সত্য, কিন্তু এখন উপায়?

দুর্গা। তুমি।

সুভা। আমার হাতে যে কিছুই নেই। এ জন্য বাবাকেও কিছু বলিতে পারিব না। তিনি কিছু দিবেন না।

দুর্গা। এতদিন খরচ তোমার হাতে ছিল। তাহ'তে কিছুই কি বাঁচাতে পারনি?

সুভা। সংসারের সকল খরচ পত্তর ক'রে তাহ'তে ক'টাকা চুরি

করিতে পারা যায়? আমি গোছাল মেয়ে, তাই তোমায় ধার কর্জ্জ কর্‌তে হয় নি। নইলে সংসার এত দিন—

দুর্গা। যা'হবার তা' হ'ত। নগদ কিছু না-ই থাকে, তোমার গহনা ক'খানা বন্ধক দিয়ে আমায় বাঁচাও।

সুভা। (সবিস্ময়ে ও রোদনের সুরে) ওগো, বাবা যে কখানা গহনা বিয়ের সময় দিয়েছিলেন, তা' যে তোমারই মঙ্গলের জন্য সধবা বলে গায়ে দি—

দুর্গা। (সক্রোধে) বুঝেছি সুভা, তুমি পরীরূপে রাক্ষসী।

এই বলিতে বলিতে দুর্গাদাস বেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। অবশেষে নানা চিন্তার পর সে তাহার শেষ অবলম্বন, মাতার আশ্রয় লইল। মা সন্তানের বিপদ শুনিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে চাহিলেন ও সে না বলিতে তাঁহার অলঙ্কারের বাক্স দুর্গাদাসের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "ইহা লও। সব বেচিয়া উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে চেষ্টা কর।" কোন ভৎর্সনা নাই, স্নেহের উৎস মুক্ত।

মাতা ও পত্নীতে কত প্রভেদ তাহা দুর্গাদাস আজ বিপদে পড়িয়া বুঝিতে পারিল।

যাহা হউক, এ যাত্রা সে বিশেষ প্রমাণাভাবে উকিলের সহায়তায় মুক্তিলাভ করিল। দুর্গাদাসের মা যেদিন শুনিতে পাইলেন হাকিম তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন সেদিন তিনি যেন হারানিধি ফিরাইয়া পাইলেন ও কালীঘাটে জোড়া পাঁটা দিয়া মা কালীর পূজা দিলেন।

দুর্গাদাস এবার মাকে কালীঘাট হইতে নিজ বাসায় আনিল। অনেক

দিন পর মাতাপুত্রে আবার ঘর সংসার করিতে বসিল। বিপদ তাহা-দিগের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে।

ইহার পর হইতে পতি-পত্নীতে ক্রমে ভাবান্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন রাগ করিয়া সুভাষিণী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

* * * *

দুর্গাদাস আর স্ত্রীকে আনিতে গেল না। কেহ লইতে আসে না দেখিয়া সুভাষিণী প্রথম প্রথম কিছু বিস্মিতা হইল। তারপর তাহার স্বামী মার সহিত ঘর-সংসার করিতেছেন বলিয়া কিছু চিন্তিতা হইল।

সুভাষিণী দেখিল, তাহার ভগিনীরা কত সুখী, সে কত অসুখী। ভগিনীপতিরা তাহাদিগকে কত প্রেমপত্র লেখেন, ভালবাসেন, আর তাহার স্বামী তাহার খবরও লন না। যদি তিনি রাগ করিয়া আবার একটা বিবাহ করিয়া বসেন, তবে যে সুভাষিণীর জন্মই বৃথা হইবে। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। সুভাষিণী আর মান করিয়া না থাকিয়া অগত্যা এক বৎসর পর নিজেই অনাহুতভাবে স্বামীর বাড়ীতে আসিল। দুর্গাদাস তাহার সহিত কথাও কহিল না। বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে সে দিনে দুই একটা সংক্ষেপে উত্তর দিত। স্বামীর এখন ঘোরতর অনাসক্তি ও উপেক্ষার ভাব। সুভাষিণী বলিয়া যে কেহ বাড়ীতে আছে তাহা যেন সে জানেই না। অথচ মার প্রতি তাহার অপরিসীম ভক্তি। হরসুন্দরী উঠিতে বলিলে দুর্গাদাস উঠে, বসিতে বলিলে বসে। দায়ে পড়িয়া সুভাষিণী সুর নরম করিল, শাশুড়ীর সেবায় মন দিল ও গৃহস্থালীর কেন কাজ তাঁহাকে করিতে না দিয়া

আপনি করিতে লাগিল। অনুতপ্তার প্রতি দুর্গাদাসের দয়ার উদ্রেক হইল বটে, কিন্তু অভাগিনী পূর্ব্বের ভালবাসা আর ফিরিয়া পাইল না।

সুভাষিণী স্পষ্ট বুঝিল, তাহার পায়ের পয়জার দাসত্ব হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে। এজন্য সে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিতাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতে লাগিল।

সুকুমার।

সুকুমার এম্‌-এ পাশ করিয়া বাড়ী আসিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, 'নমিনেসনে' ডেপুটি হইবে বা বি-এল্ দিয়া হাইকোর্টে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে দ্বারিকা মিত্রের ন্যায় জজ হইবে, অনেকে এইরূপই ধারণা করিয়াছিল। কিন্তু সুকুমায় ইহার কিছুই করিল না।

বাড়ী আসিয়া গ্রামের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই তাহার জন্মভূমি? জঙ্গল ও ডোবার একছত্র রাজ্য, অস্বাস্থ্য ও পাপের জয়ডঙ্কায় মুখরিত, এই তাহার তারাপুর? সেকালে লোক-হিতকর কার্য্যগুলি ধর্ম্মের সহিত জড়িত ছিল, পুষ্করিণী উৎসর্গ, ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, অতিথিসেবা, সদাব্রত প্রভৃতি পুণ্যকর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, লোকে ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য উহা করিত; একালে লোকের ধর্ম্মভাব লোপ পাইতেছে, ধর্ম্মের নামে যে সব কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য করণীয় ছিল, এখন তাহা অনাবশ্যক বোধে উঠিয়া যাইতেছে। সুকুমার বহুদিন তারাপুরে আসে নাই, পল্লীর দুর্দ্দশা এতদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। এখন সকল অবস্থা জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে পল্লী পূর্ব্বকালে দেবের আবাস ছিল এখন তাহাতে ভূতের নৃত্য, গ্রামের যাঁহারা মাথা তাঁহারা দেশদেশান্তরে চাকরি বা ব্যবসায়ে অর্থার্জ্জনে রত, নগরীর নন্দনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া পল্লীর নগ্নবিভীষিকা দেখিয়া শুনিয়াও নিশ্চিন্ত; দেশে

থাকে গোটাকতক অকালকুষ্মাণ্ড,—দলাদলি, পরকুৎসাকীর্ত্তন, দুর্ব্বলের জাতিচ্যুতি, ইন্দ্রিয়সেবা তাহাদের ব্রত ; গ্রামের উন্নতিতে পণ্ডিত বা মূর্খ, ধনী বা নির্ধন কাহারও লক্ষ্য নাই, কামিনী ও কাঞ্চনের পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তির জন্য লোকে লালায়িত। প্রাণশক্তি স্তিমিত, সকলে আত্মবিস্মৃত। পুরাকালে এই গ্রামগুলিই বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু ছিল, এখন উহা অনাদৃত, উপেক্ষিত। সেই ভারতীয় সভ্যতার পূত গোমুখী,' চিরন্তন উৎস আজ বিশুষ্ক। সর্ব্বত্রই ধনের তুলাদণ্ডে মনুষ্যত্বের পরিমাণ আরম্ভ হইয়াছে। ভদ্র ও চাষা-লোকের ভিতর ব্যবধান বাড়িয়াছে। ছোট বড় সকলের মধ্যে সেই অঙ্গাঙ্গী আপনার ভাব ও দাদা-খুড়ো ডাক লোপ পাইয়াছে। যে দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ শত বিপ্লবের ঘাত প্রতিঘাতেও সজীব রহিয়াছে, যাহার সহিত বহু শতাব্দীব্যাপী অতীতের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত, যাহা তাহার পবিত্রচেতা পূর্ব্বপুরুষগণের লীলাভূমি, সেই তারাপুর এখন শ্মশান মাত্র, আর সেই শ্মশানে গোটাকতক শৃগাল-কুক্কুর-গৃধ্র ও ভূত প্রেত বিচরণ করিতেছে! সুকুমার তাহার গ্রাম ছাড়িয়া আপনার সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধিকল্পে কোথাও যাইতে চাহিল না। বানরের অধিকৃত আসনে নরদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সে দৃঢ় ব্রত হইল। ইন্দ্রের অমরা ছাড়িয়া পল্লীর নরকবাসও তাহার পক্ষে শ্লাঘ্য।

ইহার পর ডেপুটিগিরির পরওয়ানা আসিলে সুকুমার তাহা প্রত্যাখ্যান করিল, 'ল লেকচার্স' পূর্ণ থাকিলেও বি, এল্ দিতে গেল না। সবিশেষ শুনিয়া কৃষ্ণভক্ত দুর্গানাথ খুড়ো এই দুর্ব্বুদ্ধি যুবককে সুবুদ্ধি দিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "বাপুহে, এ তোমার কেমন বিবেচনা?

অবশেষে এত বিদ্যাবুদ্ধি সব তারাপুরে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিবে? এই জন্যই তোমার বাবা এত খরচপত্র ক'রে তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন?"

সুকুমার বলিল, "খুড়ো, লেখা পড়া শেখা মানুষ হবার জন্য। আমি তা'রি চেষ্টায় আছি।"

খুড়ো। পাগল আর কি, ডেপুটি হ'লে, উকীল হ'লে মানুষ হয় না, মানুষ হয় বাড়ী ব'সে থাক্‌লে?

সুকু। দেশে ডেপুটিগিরির উমেদারের অভাব নাই, উকীলেরও অভাব নাই,—অভাব, গ্রামে থাকবার লোকের।

খুড়ো। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, বল কি, ওকালতির পথও ছাড়িবে?

সুকু। বহু ক্ষুরধারবুদ্ধি যাহা দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধনে নিযোজিত হইতে পারিত তাহা দুষ্ট লোকের কূট দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য নিযুক্ত হইতে দেখিয়া এই মার্জ্জিত বুদ্ধির দোকানদারিতে আর প্রবৃত্তি নাই।

খুড়ো। কিন্তু বাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা হয়ে ব'সে থাকা বড় ভাল নয়, নিরাপদও নয়।

সুকুমার দুর্গানাথ খুড়োর পুত্র ও গ্রামের অন্যান্য যুবকদিগের সহিত মিশিতে ঘৃণা করে। কারণ, তাহারা জটলা পাকায়, নেশাভাঙ্‌ করে, কুৎসিত আমোদে মত্ত থাকে, ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস ও সচিত্র নবন্যাস প্রভৃতি ছাইভস্ম পড়ে, সংবাদপত্রে কবির লড়াই দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে, বিধবাদের কলঙ্ক রটায় ও তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটায়।

আর একদল যুবক যাহারা শিক্ষিত ও বর্ত্তমান যুগের আশা, মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিত, তাহারা 'মিস্‌টিসিজম্' ভালবাসে, সেই-যে-কি অসংলগ্ন অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত, বুঝা যায়না, বুঝাইতে পারা যায় না, লেখা পড়ে ও পান্‌সে গীতি কবিতায় মাতিয়া রহে, ভাষার শ্রাদ্ধে পূর্ণ 'কলম' মাসিক পত্রে 'মুচ্‌কে হাসি' গল্প ও 'মনের মতন' ধারাবাহিক উপন্যাসে পাপকে কত সুন্দর দেখায় তাহার বিচিত্র 'সাইকোলজিক্যাল' বিশ্লেষণ পড়ে, আর পড়ে—সমালোচনা, যে-সকল সফরীবৎ সমালোচক, যাহাদের কুক্কুরবৎ পবিত্র অন্নে রুচি নাই, কেবল ভাগাড়ের দিকে লোভ,—শুঁকৃচে কোথায় পচা দুর্গন্ধ, ধাপার মাঠ ভিন্ন নব্যবঙ্গে যাহাদের অন্যত্র স্থান নাই, তাহাদের কৃত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। এই দলের সহিতও সুকুমারের মনের মিল হইল না। সে একদিন তাহাদের আসরে বলিয়াছিল, "ও সব রাবিশ আর এদেশে চলিবে না। হইতে পারে ঐ সব রচনা সুন্দর, কিন্তু উহা কাগজের ফুলের মত সুন্দর, সমাজের জমিতে শিকড় গাড়িতে পারে না। গীতিকবিতার গোধূলির আলো আর ভাল লাগে না, এখন ধ্রুব সত্যের স্পষ্ট দিবালোক চাই।" সেই হইতে এই শিক্ষিত যুবকদলের সহিত সুকুমারের বিরোধ ঘটিল।

গ্রামের যাঁহারা শিরোভূষণ, বড় চাকুরে, বড় ব্যবহারাজীব বা বড় চিকিৎসক তাঁহাদের বৈঠকে-মজলিসে বিশেষত্ববর্জ্জিত মৌলিকতাহীন অসার আলোচনা বেশী, অর্দ্ধশিক্ষিত বা মূর্খ মোসাহেবদিগের আদর অধিক, রুচি পরকুৎসাকণ্ডূয়নে ও পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার আলোড়নে,—তাহাতে 'দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বণ্' হাস্যতরঙ্গ কত! যাঁহারা গ্রামের

ভরসা, দেশনায়ক হইবার স্পর্দ্ধা রাখেন তাঁহারাও আর সকলেরই মত উদরশিশ্নপরায়ণ, কপি-কুক্কুর ও ছাগের স্বভাবে তাঁহাদেরও চরিত্র গড়া। ইহা দেখিয়া ঘৃণায় সুকুমার সেদিক হইতে মুখ ফিরাইল। ইহারাও, তাহাকে অচিরে 'ক্যাড্' পদবী দিয়া, কোণঠাসা করিয়া রাখিলেন।

সুকুমার গ্রামের জমিদারদিগকে বাল্যাবধি ঘৃণা করিত, উঁহাদের বাটীর চতুঃসীমা মাড়াইত না। অতএব উঁহাদের সহিতও তাহার সদ্ভাব রহিল না।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মূর্খের অবতার, শুধু সাপের মন্ত্র আওড়ান। কাজেই তঁহাদের সহিতও সুকুমারের যথেষ্ট বিসম্বাদ হইল।

একদিন গ্রামে এক মহাপুরুষ আসিয়া অনেক বালক ও যুবককে চিরব্রহ্মচর্য্যের ও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিলেন এবং বৈরাগ্যের পথই যে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহা বুঝাইলেন। ইহা জানিয়া সুকুমার সেই সন্ন্যাসীকে বলিল, "দেখ আনন্দভায়া, যদি ভাল চাও, এ গ্রামের স্কন্ধ হইতে শীঘ্র নামিয়া পড়। তোমরা এতকাল ধরিয়া একটা আলেয়ার পিছনে অনর্থক কতকগুলি লোককে ভুলাইয়া লইতেছ, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনায় যে মনুষ্যত্বের বিকাশ তাহার সঙ্কোচ সাধন করিতেছ। তোমার আনন্দ ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ একটা কম মোহ নয়, তুমি কিনা আবার অন্যের মোহ ঘুচাইবে? স'রে পড়, বাবা, স'রে পড়।" সাধুপুরুষ চলিয়া গেলেন। গ্রামের ধর্ম্মভীরু স্ত্রী-পুরুষ সুকুমারের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন।

এইভাবে সে চতুর্দ্দিকে শত্রুব্যূহ রচনা করিল। প্রাণের অন্তরঙ্গ কোথাও পাইল না। ভদ্রসমাজ ছাড়িয়া দিয়া সে কৃষকসমাজে অনেকটা

শান্তি পাইল, তাহাদের ভিতর স্বভাবজ সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। মনুষ্যত্বের এমন উপাদান বিকাশ করিতে সে এখন হইতে যত্নপর হইল। বিকাশের মূলে সঙ্গদান ও সঙ্গগ্রহণ। সে উভয়ই করিতে লাগিল। সুকুমার ভুলিয়া গেল সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রাজুয়েট্, ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ! চাঁড়ালে তাহার ভালবাসা, হিন্দু মুসলমানে তাহার প্রীতি।

সুকুমার যেন মূর্ত্ত সরলতা, পূর্ণ প্রফুল্লতা। বিলাসিতা নাই, আড়ম্বর নাই, পাণ্ডিত্যাভিমান নাই, ভাণ নাই, 'কাল্‌চারে'র কপট পোঁচাড়ার বাহ্যচমক নাই, কাহারও প্রতি নিষ্করুণ কৃপাকটাক্ষ নাই, আপনার জয়ডঙ্কা আপনি বাজাইবার জঘন্য রুচি নাই, অপরকে হেয় করিবার নীচ প্রবৃত্তি নাই। আছে,—নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিবার অদম্য প্রয়াস, অধঃপতিতের প্রতি অসীম সহৃদয়তা।

সুকুমার ভদ্র-ইতর হিন্দু-মুসলমানে সেকালের মিষ্ট সম্বন্ধগুলি পুনরুজ্জীবিত করিল, জাতিবর্ণনির্বিশেষে গরীব দুঃখীর বিপদে আপদে আপনার হইয়া সেবা করিতে লাগিল; কাহারও ঘরে চাল জোটে না, সে তাহার চাল আনিয়া দিল; কাহারও কলেরা বা বসন্ত হইয়াছে, সেবা চলিতেছে না, সে নিজেই তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল; কাহারও দাহ করিবার লোক নাই, সে লোক জোটাইয়া শবের সৎকার করিয়া আসিল, তাহাতে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বিচার করিল না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া খুড়ো বলিলেন, "সুকুমার, ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে এ সব কি?"

সুকুমার বলিল, "ইহাই তো বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের কাজ। আর্ত্ত ও বিপন্নের আবার জাতি কি?"

খুড়ো। বটে, তাই ব'লে তাঁতি, জোলা, হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দি, চাঁড়াল, মুসলমান সবারই সেবা করিবে?

সুকু। তা করব বই কি?

খুড়ো। সমাজকে অতটা উপেক্ষা ক'রে চলো না। সমাজের শাসন দণ্ডবিধির চেয়েও কঠোর, ইহা মনে রেখো। ছি ছি, চাষা ছোট লোক নিয়ে এত মেশামেশি, ঘেঁষাঘেঁষি, নিম্নবর্ণের সেবা, মুসলমানের সেবা,—

সুকু। খুড়ো, ওরাও মানুষ; আগে মানুষ, পরে ইতর-চাষা, হিন্দু-মুসলমান। ওদেরও মান সম্মান জ্ঞান আছে, সুখ দুঃখ বোধ আছে। আর যাহারা বুভুক্ষিতের অন্ন ও উলঙ্গের বস্ত্র যোগায় তাহাদিগকে অত ঘৃণা করিলে চলিবে কেন? আমাদের দেশের চাষারা সর্ব্বংসহ বলিয়া অম্লানবদনে জমিদারদের, মহাজনদের ও মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের সকল অত্যাচার সহিতেছে। ইউরোপ হইলে এতদিন আগুণ জ্বলিত। এদেশে সে আগুণ একবার জ্বলিলে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড হইত। আমাদের দেশে বেশীর ভাগই যে চাষা। আমরা কাজ ছাড়িয়া কথার ফুলঝুরি খেলাই, সভাসমিতিতে প্রশংসার চোথ আদায় করিয়া বেড়াই, ক্ষুদ্র লোক-দিগের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের খবরও রাখি না, বাড়াই—আত্মম্ভরিতা, ঘৃণার ও ব্যবধানের বাঁধ, বন্ধনের বৃতি। আমরা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ভালবাসায় কৃপণ। ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলের মূলই যে প্রেম তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। বড় ছোট, ভদ্র-ইতর সকলের ভিতর সৌহার্দ্দ্য ও একপ্রাণতা ভিন্ন আমাদের মঙ্গল নাই।

খুড়ো। বেশ সুদীর্ঘ বক্তৃতা, কিন্তু পল্লীর প্ল্যাটফরমে এসব কথার

আলোচনায় কেহ কর্ণপাত করিবে না, সুকুমার! আসল কথা যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি। একটু সাবধানে থেকো।

ইহা বলিয়া খুড়ো মালা জপিতে জপিতে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। গিয়াই শুনিলেন, গ্রামের চারু তাহার সহচরদিগের সহায়তায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একটি দরিদ্র বিধবাকে ঘরের বাহির করিয়াছে, আর সুকুমার সেই অভাগিনীকে নমঃশূদ্র হারাণের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে ও তাহাকে জাতিতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা শুনিয়াই খুড়ো চটিয়া লাল হইলেন। তাঁহারা সমাজের কেহ নন, সমাজের কর্ত্তা সুকুমার? যৌবনের চাঞ্চল্যে চারু যাহা করিয়াছে তাহা বরং মার্জ্জনীয়, সমাজ কবে নারীনিগ্রহকারী সতীত্বাপহারককে শাস্তি দিয়া থাকে? কিন্তু সুকুমার যে পতিতাকে পুনরায় সমাজে চালাইতে চেষ্টা করিতেছে একি হে বাপু? এত বড় স্পর্দ্ধা যাহার, তাহারও প্রলুব্ধার সমান দশাই হওয়া উচিত। দুর্গানাথ খুড়ো মালা ফিরাইতে ফিরাইতে "রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া একটা সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন।

পরদিন সুকুমার, হেডমাষ্টার শীতল বাবুর পুত্র যতীন এবং আর কয়েকজন যুবক ও বালক সেই পতিতার হস্তে অন্ন ভোজন করিয়া তাহাকে জাতিতে উঠাইবার ব্যবস্থা করিল। ইহার ফলে সুকুমার প্রভৃতি জাতিচ্যুত হইল। ইহাকেই বলে, সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান।

এই কাণ্ডের পর দুর্গানাথ খুড়ো দুঃখের সহিত সুকুমারকে বলিলেন, "দেখ, এত করিলাম, এত বলিলাম, সমাজের কেহ আমার কথায় কর্ণপাত করিল না।"

স্বাধীনচেতা যুবক প্রত্যুত্তরে বলিল, "তারাপুরের মত সমাজকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি। আমার জন্য আপনি কাতর হইবেন না।"

খুড়ো। হেঁ-হেঁ, বুঝেছ কি না, আমার কাছে আমার পুত্রেরা যেমন, তুমিও তেমনি। কিঞ্চিৎ রক্তের টান যাবে কোথায় বাপু? বড় কষ্টবোধ হয়।

খুড়ো চলিয়া গেলেন। তারপর শীতল বাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কি সুকুমার বাবু, এখন আপনার মনের ইচ্ছা বোধ হয় পূর্ণ হয়েছে? আমি পূর্ব্ব হ'তেই বলেছিলাম, "দেখুন, নিজে যাহা ভাল বুঝেন করুন, কিন্তু যতীনটাকে মাটি করিবেন না। যে আশঙ্কা করেছিলাম তাহা এখন হাতে হাতে ফলিয়া গেল। আপনি আমার কোন অনুরোধ বা মানা শোনেন নাই।"

সুকু। যতীন আমাকে ভালবাসে, তাই কাছে আসে। তা'কে কি ব'লে তাড়িয়ে দেব বলুন! সে আমার সঙ্গপিপাসু, তাহার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু আমার সঙ্গলাভের জন্য উন্মুখ। আমাকে দোষ দেন কেন?

শী। আপনি তাহাকে যাদু করিয়াছেন। বাপমার সঙ্গ তাহার ভাল লাগে না, ভাল লাগে আপনার সঙ্গ? লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা এবার আই, এ দিত। তা' লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল।

সুকু। আপনার পুত্র অতি সচ্চরিত্র ও কুশাগ্রবুদ্ধি। যেরূপ শিক্ষায় আমাদের স্বরূপ জাগে, যাহাতে আমাদের সহস্র বৎসরের সঞ্চিত স্বরূপ মূর্ত্ত হয়, যাহাতে আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, আত্মসংযম বাড়ে, নিষ্ক্রিয় বা পুত্তলিকা হইতে ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়, সেই শিক্ষালাভের জন্য সে ব্যগ্র। ভ্রান্ত শিক্ষারূপ মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতে তাহার

প্রবৃত্তি হয় না। যে শিক্ষার মূলে মনোবুদ্ধিচিত্তঅহঙ্কারশুদ্ধির পরিচেষ্টা নাই, সেজন্য অবিশ্রান্ত কর্ম্মের আরাধনা নাই তাহাতে তাহার রুচি নাই। ভগবান্ ব্রহ্মাও "তপোঽ তপ্যত, সঃ তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত", আর আমরা মানুষ গড়িতে গিয়া তপঃ দ্বারা অন্তঃ-করণশুদ্ধির চেষ্টা না করিয়া কেবল অধীত বিদ্যা শিক্ষা দিই। যতীন সার বুঝিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার সনাতন ধারা, যাহার প্রচ্ছন্ন প্রবাহ ফল্গুর মত যুগযুগান্তর ধরিয়া অতীতের কোল হইতে বহিয়া চলিয়াছে, যতদিন না তাহা আমাদের শিরায় শিরায় বন্যার ন্যায় বহিতেছে ততদিন আমরা 'আমরা' নহি। শীতল বাবু, দুঃখ রহিল, আপনি এখনও যতীনকে চিনিতে পারিলেন না।

শী। তাহার ফলে তো এই,—সেই প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার সন্তানিকা স্বরূপ যে সমাজ তাহা হইতে বহিষ্করণ?

সুকু। সে সমাজ এ সমাজ নয়। উহার কর্ত্তা হইবে যতীনের মত ন্যায়ের উপাসকেরা।

শীতল বাবু এরূপ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে যে অগ্নির উৎপত্তি হইল তাহা যথাসময়ে বলা যাইবে।

সুকুমার আর্য্যাচরিত পথে চলিতে লাগিল। তবে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানেতিহাসের নিকট ঋণী বলিয়া সে কখনও লজ্জিত হয় নাই, দেশকালপাত্রবিবেচনাবিরহিত হইয়া প্রতীচ্য সমাজের অন্ধ অনুকরণ ও আত্মবিস্মৃতিই তাহার প্রধান ঘৃণার বিষয় ছিল। যতীনের ন্যায় তাহার আরও দুইটি শিষ্য ছিল। বসুন্ধরার মত সহিষ্ণুতা, মাতার ন্যায় স্নেহ, দেবতার তুল্য ক্ষমা লইয়া সুকুমার তাহাদের স্বরূপ জাগাইতে ব্যাপৃত

থাকিত, তাহাদের ভিতরের প্রাণবস্তু মুকুলিত করিয়া আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধার উন্মেষ করিতে যত্নবান্ হইত। এই তিনটি ছাত্রকে শিক্ষা দিয়াই সে পরম সন্তুষ্ট। কালে এই তিন শিষ্য হইতে তিন শত কর্ম্মীর উদ্ভব হইবে এরূপ আশায় সে উৎফুল্ল ও উৎসাহান্বিত হইত।

ইহা ছাড়া, সুকুমার সন্ধ্যার পর তাহার বাড়ীতে সমবেত হিন্দু মুসলমান চাষা মজুর তাঁতি ছুতার প্রভৃতিকে লেখাপড়া শিখাইতে ও তাহাদিগকে মুখে মুখে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, স্বাস্থ্যবিধির কথা প্রভৃতি বুঝাইতে লাগিল; আর, অবসর মত তাহাদের ছোট ছোট ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ ও ভারতেতিহাসের বহু নীতিগর্ভ গল্প শুনাইতে লাগিল। এইরূপে সে ও তাহার শিষ্যেরা তারাপুরের চাষাদের পরম শুভানুধ্যায়ী হইয়া দাঁড়াইল, তাহাদের বিপদে আপদে পরমাত্মীয় তো পূর্ব্ব হইতে ছিলই। সুকুমার চাষের ও তাঁতের সময়োচিত সংস্কার, গোশালার সংস্কার, জঙ্গল কাটা, ডোবা খাল ভরাট প্রভৃতি ক্ষুদ্র অথচ অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলিতে মন দিল,—ভদ্রলোকের মজলিসে ঠাট্টাবিদ্রূপের নূতন উপাদান জুটিল; ভদ্র-ইতর সকলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য সে নিজব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিল, তাহাতে কাহাকে স্নান করিতে বা কাপড় কাচিতে দিল না,—অতএব অনেকে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল; গ্রামের রাস্তা ঘাট সংস্কারের জন্য সে জেলাবোর্ডে লেখালেখি করিয়া ও উহার মেম্বরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু কিছু কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইল। এইরূপে গ্রামের উন্নতিবিষয়ক কার্য্য করিতে পারিয়া সুকুমার নিজে পরম আনন্দ লাভ করিল, কিন্তু তাহার কাজে কেহ খুসী হইল না। সংসারে

যে আপনার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য চাতুরীর উর্ণনাভ রচনায় পরাঙ্মুখ হইয়া স্বার্থ পরার্থে আহুতি দিতে পারে আত্মপ্রসাদই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ইতিমধ্যে তারাপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনাবৃষ্টি হইয়া রৌদ্রতাপে সকল শস্য জ্বলিয়া গিয়াছে, প্রজারা খাইতে পায় না। ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরবাসী চাষা ভূষার সুখদুঃখের সহিত জমিদারবাবুদিগের কোন দিনই সম্পর্ক নাই,—সম্বন্ধ কেবল বাকি খাজানা আদায়ের বেলা সদর্পে সুমধুর সম্বোধনে বহুদিনের অপ্রযুক্ত লাথিজুতার সহিত সম্বর্দ্ধনার সময়। মহাজনেরাও তদ্রূপ। কেবল সুদ বাকি পড়িলে উহাদের কথা মনে পড়ে! মানুষের জন্য মানুষের প্রাণ কাঁদার মত কাহারও প্রাণ কাঁদে না। অতএব এই দুর্ভিক্ষের সময় জমিদার, মহাজন বা অন্য কেহই হতভাগ্যদিগের সাহায্যের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা ছোট লোকের আর্ত্তনাদে 'বড় লোকে'র মত উপেক্ষা করিলেন ও মনে মনে কহিলেন, "কেমন ব্যাটারা জব্দ হয়েছে! চাষাদের বাড়াবাড়ি বড়ই বেড়েছিল। এখন কেমন সিধে।" বিপদে পড়িয়া তাহারা গ্রামস্থ মুসলমানগণের নেতা ধনাঢ্য বড়মিঞা সাহেবের নিকটে গেল। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের ধর্ম্মের গুরু, চালের গুরু নই। জমিদারবাড়ী যাও। জমিদার খেতে না দেয়, বাজার লুট কর, বাবুদের বাড়ী চড়াও কর, মহাজনদের বাড়ীতে ডাকাতি কর।"

চাষাদের রক্তবর্ণ চক্ষু, ক্ষুধায় তাহারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। আগ্নেয়গিরির বহুদিন সঞ্চিত রুদ্ধ স্রাবের মত তাহাদের ক্রোধ আজ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারদের বাড়ীতে ভীষণ জনস্রোত। তাহাদের মুখে

কেবল এক কথা, "খেতে দাও বাবু, নইলে বাজার লুট করব, ভদ্রলোকের মাথা ফাটাব, তাদের মেরে তবে আপনারা মরব। এমনিও মরা, অমনিও মরা।"

জমিদারেরা বিপদ দেখিয়া মহাজনদের ডাকাইলেন। তাহাদিগকে চালের দর কমাইতে বলিলেন। তাহারা সম্পূর্ণ অস্বীকার হইয়া বলিল, "আপনারা যখন আমাদের ব্যবসায়ে হাত দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখন আপনারাই ব্যবসায় চালান।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া দেওয়ানজি মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিয়া বলিলেন, "সুকুমার বাবুর পরামর্শ না নিয়ে আমরা কিছু করতে পারচিনে। তিনি কাল পরশু কাটোয়া হইতে ফিরবেন। তখন তোমাদের যা হয় একটা গতিবিধি করা যা'বে। তিনটা দিন অপেক্ষা কর।"

চাষারা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। আশু বিপদ কাটিয়া যাওয়ায় বাবুরা দেওয়ানজীকে ধন্যবাদ দিলেন।

ইহার পর সুকুমার আসিলে প্রধান ভূম্যধিকারীর বাড়ীতে বৈঠক বসিল। চাষারা বাহিরে দল বাঁধিয়া, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া রহিল। সুকুমার বলিল, "চাল সাড়ে আট টাকা মনে বিক্রয় হইতেছে। উহা ছয় টাকা মনে পৌষমাস পর্য্যন্ত বেচিতে হইবে।" মহাজনেরা মহা রুষ্ট হইয়া বলিল, "আমরা কিনেছি সাড়ে সাত টাকা মনে। মোটে একটাকা মণ পিছু লাভ করিতেছি। ছয় টাকায় বেচিলে লোকসান হইবে মণকরা দেড় টাকা। আমরা এ ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি হইতে পারি না।"

"তবে আপনারা যাহা ভাল বোধ হয় করুন" বলিয়া সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।

চাষাদের সর্দ্দার মাণিক মোল্লা গর্জ্জিয়া বলিল, "বাবুর বিচার খুব সাফ্ হয়েছে।—মণকরা লোকসান দেড় টাকার বার আনা দিবে মহাজনেরা ও আর বার আনা দিবে জমিদার বাবুরা।"

অনেক তর্কের পর তাহাই স্থির হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া জমিদার ও মহাজনেরা অগত্যা রাজি হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে মাণিক বলিল, "বাবু, এবার বৃষ্টি বিনা ধান সব মরে গেছে। অনেকে ছয় টাকা মণেও চাল কিনে খেতে পারিবে না।"

সুকুমার বলিল, "তাদের জন্যই আমি কাটোয়ায় গিয়েছিলাম। সেখান হ'তে সস্তা দরে একশ মণ চাল কিনে এনেছি। এখন এই চাল খেয়ে তারা বাঁচুক। আবার যখন লাগ্‌বে আন্‌তে যাব।"

চাষারা তাহা শুনিয়া সুকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া দেখিল, সুকুমার মানুষ নয়, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ দেবদূত।

মাণিক বলিল, "বাবু, খোদা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন! আমাদের মধ্যে যারা কিনে খেতে পারে তাদেরও এখন বড় অনাটন। সস্তায় পাট বেচে যে যেমন করে পারে পেট চালাইতেছে। এখন মাস তিনেকের জন্য অল্প সুদে টাকা ধার পেলে অনেকে সেই পাট পরে কুড়ি টাকা মণে ছেড়ে বিপদ থেকে বাঁচ্‌তে পারে।"

সুকু। তাই হবে। আর তিন মাস কেন, তিন বছরও যদি আকাল থাকে আমি তোমাদের সাহায্য কর্‌ব। আমার বাবা যা কিছু রেখে গেছেন তা শুধু আমার নয়, তোমাদেরও। বিপদে প'ড়ে

ভাইরা আমার কাছে টাকা ধার নেবে, আমি তাদের কাছ থেকে সুদ খাব? দেনা আমি কাউকে দেব না। যার যা লাগে নেবে। আমি কি তোমাদের পর, তোমাদের ছাড়া?

চাষারা ভাবিল, যাদের জন্য আমরা এত করি, গ্রীষ্মে তেতে, বর্ষায় ভিজে, শীতে কেঁপে ক্ষেতে ক্ষেতে খেটে মরি, তারা আমাদের খেতে দিতে চায় না। এই আকালের দিনে তারা মুখের সহানুভূতিও করিল না, কেবল ভয় দেখাইয়া চালের মণ কমান গিয়াছে। আর এই দেবতা, আমাদের পুণ্যে এই তারাপুরে জন্মিয়া, আমাদের সুখদুঃখে কত আপনার,—বাপের মত উন্নতিকামী, মায়ের মত স্নেহার্দ্রহৃদয়!

সুকুমারের অসামান্য দয়া দেখিয়া চাষাদের অনেকে কাঁদিয়া ফেলিল। হারাণ 'বাপ', 'বাপ', বলিয়া তাহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল। সুকুমারের চক্ষুও এই দৃশ্যে অশ্রুছলছল হইয়া উঠিল।

যাহা হউক, ইহার পর বছর দুর্ভিক্ষ কাটিয়া গেলে কুচক্রীরা চতুর্দ্দিকে হিন্দুমুসলমানে বিরোধসৃষ্টি করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। বড় মিঞা বলিলেন, "আমি খবর পেয়েছি, কোম্পানী আমাদের হিন্দুর বিধবাদের জোর ক'রে নিকা করিতে হুকুম দিয়াছেন। তবে আর কেন, ভাই সব, আর আর জায়গায় যা হচ্ছে তোমরাও তাই কর।" এইরূপ অসত্য ও কুৎসিত প্রস্তাবে সর্দ্দার মাণিক মোল্লা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "আকালের সময় কোথায় ছিলে, চাচা? তখন তো হিন্দু ভাইএরাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। এ গ্রামে যে হিন্দুর উপর অত্যাচার করবে আমি তার মুণ্ড ছিঁড়ে ফেল্‌ব। চাচা, ফিরে যাও, তারাপুরে ওসব চালাকি খাট্‌বে না।"

বড় মিঞার মোড়লির দর্প হঠাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। একটা চাষার মুখে এত বড় কথা! তিনি হাঁ করিয়া মাণিক মোল্লার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। শুনা যায়, এই ঘটনার পর হইতে মিঞাসাহেবের স্বভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। একদিন তাঁহার কোন স্বজাতীয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তারাপুরের সকল মুসলমানের নেতা, উচ্চবংশের লোক। একটা চাষাকে আমার চেয়ে বড় হইতে দিব?" সুকুমারকে তিনি পরশপাথর জ্ঞানে এখন হইতে ভিন্নচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে গ্রামের স্কুলে এক হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিল। একদিন ডাকে কতকগুলি রাজদ্রোহমূলক বিজ্ঞাপন আসিল ও হেডমাষ্টার শীতল বাবু সেই সূত্রে স্কুলের একজন কুস্তিকসরৎপ্রিয় দুর্দ্দান্ত ছাত্রকে দমন করিতে ও সুকুমারকে জব্দ করিতে মতলব আঁটিলেন। একটি স্বদেশী মামলা খাড়া করিয়া নিজের উন্নতি করিতে শীতল বাবুর অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা ছিল। এবার সে সুযোগ ঘটিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে তারাপুরের নিকটবর্ত্তী হরিপুর গ্রামে একটি ভদ্রলোকের বাটীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছিল। বালককে ইহার সহিত জড়িত করিয়া ও সুকুমারকে সকল কাণ্ডের মূল বলিয়া তিনি পুলিশের হাতে তাহাদের বিরুদ্ধে এক সঙ্গীন মামলার মালমশলা যোগাড় করিয়া দিলেন। বালকটির নাম ভূপেন। সে ডাকাতির দুই দিন পূর্ব্ব হইতে স্কুলে হাজির ছিল না ও কেহ কেহ তাহাকে সুস্থ শরীরে হরিপুরের আশে পাশে সেই কয়দিন ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে, শীতল বাবু পুলিশে এরূপ সংবাদ দিলেন। ভূপেন গ্রেপ্তার হইলে চিন্তায় ও শোকে তাহার বিধবা মাতা পাগলিনী হইলেন।

সুকুমার প্রথমাবধি নির্ব্বিকার ছিল। সে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকীল নিয়োগ করিল না। দেখিয়া শুনিয়া গ্রামের চাষারা আপনাদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া জনৈক দক্ষ উকীলকে আসামীর পক্ষে দাঁড় করাইল। সুকুমার তাহাতে খুব কুণ্ঠিত হইলেও চাষারা কোন নিষেধ মানিল না। সুকুমারের বিপদে তাহারা নিজেদের বিপদ জ্ঞান করিয়াছিল।

অনেক দিন ধরিয়া দায়রায় মামলার শুনানি হইল। দুর্গানাথ খুড়োর ইদানীং ভাবাবেশে রোমাঞ্চ, স্পন্দন, শিহরণ প্রভৃতি হইত। তত্রাচ হাতে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি আদালতে নির্জ্জলা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। চতুর উকীলের সওয়ালে খুড়োর জবানবন্দী ও জেরায় আকাশপাতাল পার্থক্য দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া উকীল বাবু বলিলেন, "আর কেন, মশায়, এবারে মালাটি রেখে দিয়ে যেমন খুসী ব'লে যান!" উকীল বাবুর কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। তাহাতে খুড়ো অপ্রতিভ হইয়া সক্রোধে বলিলেন, "উকীল মশাই, জেরা করিতে হয় জেরা করুন। মালা ঝোলায় আপনার প্রয়োজন কি?" তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দর্শনে সমবেত ব্যক্তিগণের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল।

জমিদারবর্গ যে সব সাক্ষী হাজির করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন তাহারাও জেরায় সব উল্টা পাল্টা বলিয়া গেল। সুকুমারের প্রতি আক্রোশেই এই সকল বুভুক্ষিত ভূস্বামীগণ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রজাদিগকে যথেচ্ছপীড়ন ও শোষণ করিলে সুকুমার তাহাতে বিষম প্রতিবাদী হয়, সকল রাইয়ত তাহার একান্ত অনুগত, বিচার শালিসিতে তাহারা নিজেদের জমিদারকে মধ্যস্থ না মানিয়া তাহাকে মানে, এতটা বেয়াদবি তাঁহারা অম্লানবদনে সহিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

শীতলবাবু বড় মিঞা সাহেবের সাক্ষ্যের বিশেষ ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিঞা যে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার জানা ছিল না। মিঞা সাহেব বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ইহা একটা সাজান মামলা। আমি আপনাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিব।" বড় মিঞা কার্য্যতঃও তাহাই করিলেন। পুলিশ তাঁহার চেষ্টায় অনেক সত্য কথা জানিতে পারিল।

যতীন তাহার পিতার বিরুদ্ধে অনেক অপ্রিয় সত্য বলিল। তাহাতে শীতল বাবু ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, তুই যার ঔরসে জন্মিয়াছিস্ তারই শত্রুতা কর্‌চিস্?" যতীন সপ্রতিভভাবে তরণী সেনের কথায় প্রত্যুত্তরে কহিল, "পিতা হন, ভ্রাতা হন, হউন জননী, দেশের যে শত্রু তা'রে শত্রু বলে জানি।"

যাহা হউক, সুকুমার ও ভূপেনের বিরুদ্ধে ডাকাতির মকদ্দমাটি আদ্যোপান্ত মিথ্যা সপ্রমাণ হইয়া গেল। জজ সাহেব তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া শীতল বাবুকে পুলিশে মিথ্যা সংবাদ দেওয়া, মিথ্যা মকদ্দমা সাজান, মিথ্যা জবানবন্দী দেওয়া, স্কুল রেজিষ্টারে ভূপেনের হাজিরায় জাল করিয়া অনুপস্থিত লেখা ও ঐরূপ জাল দলিল আদালতে ব্যবহার করায় তাঁহাকে ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করিলেন ও দুর্গানাথ খুড়ো প্রভৃতি কয়েকজনকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারায় অভিযুক্ত করিলেন।

তারাপুরের চাষারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সুকুমার ও ভূপেন এইরূপে মেঘনির্ম্মুক্ত রবির ন্যায় বিপদজাল ভেদ করিয়া আদালত হইতে বহির্গত হইলে টাউন স্কুলের ছেলেরা তাহাদের

গলায় মাল্য দান করিয়া তাহাদের গাড়ী টানিয়া যাইতে চাহিল। সুকুমার তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিল, "এটা নিতান্ত প্রহসনের মত হবে। তোমাদের ভালবাসাই আমাদের যথেষ্ট সম্মান।"

এদিকে শীতল বাবুর হাতে হাতকড়ি পড়িতেই তিনি পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুকে বলিলেন, "এই বুঝি আমার রায় সাহেবির প্রথম মহড়া?" ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "আমি আপনাকে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া রায় সাহেব হইতে বলি নাই। আমাদের বিশ্বাস ছিল, আপনি শিক্ষাবিভাগের লোক, যাহা বলিবেন সত্য বলিবেন। দেখুন, আজ তেইশ বছর আমি পুলিশবিভাগে কাজ করিতেছি। এখনও মধ্যে মধ্যে আমার সাবেক মাষ্টারি জীবনের সততা, সরলতা ও পবিত্রতা উঁকি দেয়। আর আপনি একজন পুরানো হেড্ মাষ্টার, আপনার এই স্বভাব?"

সুকুমার দায়রায় অভিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে "কৃষক ও ভূম্যধিকারী" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ সন্দর্ভ লিখিয়াছিল। তাহাতে সে সপ্রমাণ করিয়াছিল যে, মানুষের হাত পা শ্রমের জন্য, উদারান্নের নিমিত্ত দৈনন্দিন সংগ্রামের জন্য; মস্তিষ্ক চিন্তার জন্য; যাহারা এইরূপ কায়িক শ্রমবিমুখ তাহাদের না আছে ধর্ম্ম, না আছে নীতিজ্ঞান; চাষীরাই জমির প্রকৃত স্বামী, বর্ত্তমান ভূম্যধিকারীরা এই অর্থে ন্যায্য স্বত্বাধিকারীদিগের বেদখলকারী দস্যু বা তস্করমাত্র; যাহারা স্বয়ং চাষ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র নিঃস্ব ব্যক্তির শ্রমে বিলাসব্যসনে সুখভোগ করে তাহারা দাসত্ব প্রথার পুনঃপ্রচলনকারী ঘৃণিত ব্যবসাদার মাত্র। এরূপ সন্দর্ভ কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক প্রকাশ করিতে রাজি হইয়া

ছিলেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া সুকুমার জনৈক সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন, "আপনারা শত যোজন দূরে থাকিয়া, বর্ত্তমান রণনীতি চর্চা না করিয়া, যুযুধান জাতিসমূহের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিবরণ না জানিয়া, বড় বড় জেনেরালের যুদ্ধ ষ্ট্র্যাটেজি লইয়া কলম কলম সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, অথচ দেশের মঙ্গলামঙ্গল যাহাতে নির্ভর করে এমন গুরুতর বিষয়ের একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছাপিতে পারেন না?" সম্পাদক মহাশয় উত্তরে জানাইয়াছিলেন, "ক্ষমা করিবেন, ভদ্রলোকের কাগজে চাষাদের কথা দিয়া পৃষ্ঠা পূরণ করিতে অক্ষম। আপনার প্রবন্ধ দুই বৎসর ধরিয়া ছাপিলেও সম্পুর্ণ হইবে না। অধিকন্তু গ্রাহকগণ শীঘ্রই কাগজ লওয়া ছাড়িয়া দিবেন। কেবল সাধারণ পাঠকবর্গের মুখরোচক রচনাই আমরা পত্রস্থ করি। আপনি চটুলবচনে সরস গালাগালি দিতে পারেন, মহাশয়? অথবা কাতুকুতু দিবার মত পাঠকদিগকে প্রাণ ভরিয়া হাসাইতে পারেন কি?" বিরক্ত হইয়া সুকুমার তাহার সন্দর্ভ প্রকাশকের নিকট ছাপিতে দিল। প্রকাশক জানাইলেন, "আজ-কাল উন্নতিশীলসম্প্রদায়ের মধ্যেও বড় কেহ ভাবিতে চাহেন না, গবেষণার 'গ' শুনিলেই অনেকের প্রহ্লাদের দশা হয়, বই আর পড়া হয় না। কাজেই উহা ছাপিয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে, আপনার এ বহি ভূস্বামীদিগের মধ্যে কোন আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে না। সংবাদ পত্রের স্তম্ভে বা সভাসমিতিতে ইহা লইয়া কোনরূপ হুলস্থূল পড়িবার সম্ভাবনা নাই, কুড়ি খানির বেশী বই বিক্রয় হইবে না।" এরূপ উপদেশসত্ত্বেও "কৃষক ও ভূম্যধিকারী" পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছিল। আসামীদের তরফের উকীল এই পুস্তকের

বর্ত্তব্যগুলির সহিত কৃষকদিগের উন্নতিকল্পে তারাপুরে অনুষ্ঠিত সুকুমারের কার্য্যবিবরণ ও একটি প্রলুব্ধা অবলার পক্ষসমর্থনে তাহার অন্যায় পূর্ব্বক জাতিচ্যুতি এবং তৎসূত্রে শীতল বাবু প্রভৃতির সহিত বিরোধসৃষ্টির বিষয় যথাসময়ে জজ সাহেবের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জজ সাহেব মামলা মিটিয়া গেলে সুকুমারের সহিত এদেশের কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন।

ইহার পর তারাপুরে ফিরিয়া আসিয়া সুকুমার চাষাদের জন্য একটা নৈশবিদ্যালয় খুলিল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিল। সে ও তাহার তিন শিষ্যই এখন উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সূর্য্যের কিরণ যে ভাবে প্রত্যেক কুসুমকলির উপর পড়িয়া তাহার প্রতি অণুতে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ফুটাইয়া তোলে তেমান উহারাও নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়া এই উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্ম-চৈতন্য উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

গ্রামে এইরূপ নবজীবনের সূত্রপাত ও চাষীদের অবস্থোন্নতি দেখিয়া সুকুমারের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সে ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া একাগ্র হইয়া যাহাতে হাত দিয়াছিল তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছিল। বিশেষ, কথায় ও কাজে আজকাল যে স্বর্গমর্ত্ত্যের ব্যবধান দৃষ্ট হয় তাহার তাহা ছিল না।

জজ সাহেব সুকুমারের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রথম হইতেই কেমন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সুকুমারের সহিত পত্রযোগে এদেশের কৃষকদিগের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিতেন ও একবার ছুটিতে তারাপুরে আসিয়া সুকুমারের নৈশবিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিয়া যান। শুনা যায়, তিনি জাতিতে আইরিশ এবং

তাঁহার পরলোকগত পিতা শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরে তাঁহার একমাত্র পুত্র আরগোনের যুদ্ধে নিহত হয়। তিনিও জাতীয় সম্মান রক্ষার্থে প্রৌঢ়বয়সে যৌবনের তেজ লইয়া সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। যাইবার সময় তাঁহার বঙ্গদেশে অর্জ্জিত অর্থ হইতে দশ হাজার টাকা সুকুমারের হস্তে তাহার বিদ্যালয়ের জন্য দিয়া যান ও অবশিষ্ট অর্থ অ্যাম্বুল্যান্স কোরে দেন।

সুকুমারের অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি ক্রমে উন্নত প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। তাহার পল্লীর কৃষকসমাজ অচিরে অনেক জেলার আদর্শস্থল হইল। তারাপুর এখন আর সে তারাপুর নয়। স্বাস্থ্য, পুণ্য, আনন্দ, মৈত্রী এখন সেখানে একাধারে বিরাজমান।

রসভঙ্গ।

বসন্তকাল, গন্ধবাহী মলয়পবনের মৃদুল বীজন, কোকিলের আকুল কুহুস্বর কতিপয় প্রৌঢ় বাবুর অবশ প্রাণ সরস করিয়া তুলিল। তাঁহারা স্থির করিলেন, ফিরে শনিবার রাজা কুরমচাঁদের বাগানবাড়ীতে চড়িভাতি করিবেন। বাঈজির বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। চাঁদা উঠিল, যোগাড় হইল, অবধারিত সময়ে সকলে না পঁহুছায় রওনা হইতে বেলা প্রায় উত্তীর্ণ হইল,—কারণ, কথায় যাহাই বলি, কার্য্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে আমরা বে-পরওয়া। যাহা হউক, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোনমতে প্রথম দল রওনা হইয়া গেল। তাহাতে ছিলেন ডেপুটি মিঃ লোড়ী (লাহিড়ী), দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু পাঁচকড়ি, সিনিয়ার উকিল বাবু গোষ্ঠবিহারী, সব রেজিষ্ট্রার রায় সাহেব, ওভারসিয়ার দাশু ঘোষ, জামাই বাবু অতুলকৃষ্ণ। আহা, বারোমাস একভাবে এস্তাজারির পর অনেকেরই মধ্যে মধ্যে যে একটু আরাম করিবার ইচ্ছা হইবে তাহাতে নারাজ হইলে চলিবে কেন? বয়স হইয়াছে বলিয়া জীবনের সখটুকু, সাধটুকু, সুখটুকু তো আর মেটে নাই!

বাগানবাড়ীতে পঁহুছিয়া ফরাসে বসিয়া অতুল বাবু হারমোনিয়াম ও দাশু বাবু বাঁয়া তবলা ধরিলেন। মুন্সেফ আদালতের পেয়াদা হরনাথ ভট্টাচার্য্য ভাল রসুইয়ে, রাঁধিতে গেল। দুইটি "ছোক্‌রা" বাবুদের সেবায় রত হইল, আর দুই জন খানসামা হরনাথকে যোগাড় দিতে গেল।

অতুল বাবু গান আরম্ভ করিতেই মিঃ লোড়ী ঘোষণা করিলেন, "এ আসরে শ্যামাবিষয়ক বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত প্রোস্ক্রাইব্‌ড্ হইল। ইহা ছাড়া যা খুসী গাও।"

অতুল বাবু একটি আধুনিক প্রেমসঙ্গীত গায়িতে আরম্ভ করিলে উহা শেষ হইতে না হইতেই বাহবা বাহার ধুম পড়িয়া গেল। তারপর তিনি যাই গায়িলেন, "ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে" অমনি আবার বাহবা পড়িয়া গেল। পাঁচকড়ি বাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এখনকার কৃত্রিম প্রেমসঙ্গীতে ও খাঁটি বাঙ্গালার স্বভাবসুন্দর সঙ্গীতে প্রভেদ দেখ!" মিঃ লোড়ী হাঁকিলেন, "চুপ্ কর, এ তোমার সাহিত্যের আসর নয়। কি বুঝিবে তুমি, মুন্সেফ? এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, গভীর এ আধুনিক প্রেমসঙ্গীত বুঝিবে?" অতুল বাবু তার পর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান গাহিয়া সকলকে তৃপ্ত করিলেন।

প্রথম হইতেই তামাকের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধি চলিতেছিল। এখন বাবুরা ক্রমে তাহা ছাড়িয়া একটু ঢুকু ঢুকু—আর একটু ঢুকু ঢুকু পান করিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দল পঁহুছিয়া প্রথম দলের কার্য্যে যোগ দিলেন। রায় সাহেব বলিয়া উঠিলেন. "লোড়ি, এই যে তোমার পেস্কার এখানে। শুনেছি, খুব ভাল অ্যাকট্ কর্‌তে পারে।" পেস্কার বাবু নানারূপ ওজর করিতে লাগিলেন। তর্ হইয়া ডেপুটী বাবু বলিলেন, "কর না হে অ্যাকট্, লজ্জা কি?"

তবু পেস্কার রাজি নয় দেখিয়া তিনি নিজেই মানভঞ্জনের পালা হইতে কতকটা আবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "এটা আমার আদালত নয়, পেস্কার! এখানে একমাত্র সবঅর্ডিনেসন সুরাদেবীর। তাঁর সাধারণ

তন্ত্র রাজ্যে সবাই সমান। কর অ্যাক্ট্।" পেস্কার বাবু থতমত ভাবে বলিলেন, "জানিলে আপনাদের কি এত ক'রে বল্‌তে হ'ত?"

রায় সাহেব। তুমি কত বার গোবিন্দলাল সেজেছ!

পেস্কার বাবু। আজ্ঞে সে আমি না, ভুবন।

উকীল বাবু। চালাকি হবে না চাঁদ,—সে তুমি, নিশ্চয় তুমিই—তোমাকে অ্যাক্ট্ কর্‌তেই হবে। জানা না জানার ওজর ইর্‌রেলেভ্যান্ট্।

পেস্কার বাবু। (করযোড়ে) মাপ করুন আমাকে,—রক্ষে করুন। আমি অ্যাকটিং আদৌ জানি না।

উকীল বাবু। বটে, জাননা?—বেশ, যে ক'টা কথা এখন বল্লে, তাই হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল দেখি।—অ্যাকটিং জান না, এমন কথা হোতেই পারে না। স্কুলে মাষ্টারের হাতে কাণমলা খেয়ে যে করুণ রস বাল্যকালে উথ্‌লে উঠেছিল তা মনে কর দেখি। তার পর, গহনা না পেয়ে, গিন্নীর রৌদ্র রস ভাব দেখি। বাঙ্গালীর প্ল্যাটফর্ম্মের বীর রস মনে করে দেখ দেখি। আবার মিলের ছোক্‌রা সাহেবের 'শালা, শূয়রকা বাচ্চা!' সম্বোধন শু'নে একগাল হাসিতে হাসিতে "হুজুর মা বাপ, আমি হুজুরের আইনসম্মত ভাই, এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয়" বলিতে বলিতে বাবুর দন্ত বাহির করিয়া হাস্য রসের অভিনয় ভেবে দেখ দেখি। বস্—আর বেশী কিছুর প্রয়োজন নাই। অ্যাক্‌টিং আল্‌বৎ পার্‌বে।

বেচারাকে আর কিছু বলিতে অবসর না দিয়া হলের মাঝখানে দাঁড় করান হইল। অগত্যা পেস্কার বাবু গোবিন্দলাল ও রোহিণীর পার্ট অভিনয় করিতে লাগিলেন। যখন তিনি বলিলেন, "চুপ্ ক'রে

দাঁড়াও, নড়োনা! এই দেখ পিস্তল ভরা আছে। কেমন মর্‌তে পার্‌বে?" "না, না, মেরো না, মেরো না, আমি মর্‌তে পার্‌ব না। আমায় মেরো না, মেরো না!" "কি আশ্চর্য্য, রোহিণি, এখনও তোমার বাঁচবার সাধ হয়? না, না, তা' হবে না, তোমার বাঁচা হবে না। তুমি না মর্‌লে আমার মত অনেকে প্রতারিত হবে। চুপ্‌ ক'রে দাঁড়াও, এই দেখ পিস্তল!—" তখন সকলে "চুপ ক'রে দাঁড়াও, এই দেখ পিস্তল ভরা!" বলিয়া হাসির রোঁল তুলিয়া দিলেন।

রায় সাহেব বলিলেন, "তবে পেস্কার বাবু, অ্যাকট্‌ কর্‌তে ব'লে জান না? নাও, এবারে একটা গাও তো!"

পেস্কার বাবু। আজ্ঞে তা—তাল মান জানা নাই।

ডেপুটী বাবু। আরজি নামঞ্জুর। এখানে তালকে তালাক্‌ দেওয়া গেছে, সব বেতাল। তবু লজ্জা কর্‌চ? আচ্ছা, এস দেখি পাঁচকড়ি নাচ তো।

এই বলিতে বলিতে ডেপুটী বাবু কোট ফেলিয়া দিয়া টাই প্যাণ্ট সমেত দাঁড়াইয়া গাহিতে লাগিলেন, "কলঙ্কেতে ভয় ক'রো না বিধুমুখি!" মিঃ লোড়ী হাল্‌কা পান্সি, পাঁচকড়ি বাবু মালবোঝাই নৌকা। উভয়ে উভয়ের কটিদেশ ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন ও মিঃ লোড়ি মধ্যে মধ্যে পেস্কারের চিবুক নাড়া দিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ঠুন্‌ ঠুন্‌—ঠুন্‌ ঠুন্‌—টুক্‌ টুক্‌ সঙ্গতও চলিল। মুন্সেফ বাবু তাঁহার আবক্ষশ্মশ্রু ও মুষ্কশোথ সত্ত্বেও মালিনীর বেশ পরিয়া অর্দ্ধ ঘোমটা দিয়া বেদম নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পেস্কার বাবু গান ধরিলেন, "আজ আমি মালঞ্চে যাই যাদুমণি!" সকলে "বেশ, বেশ, ব্রেশ, সাবেশ" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

"মুন্সেফ বাবুর এখন কতকটা আদম ও ঈভের অবস্থা। উকীল বাবু পূর্ব্ব হইতেই কিছু তর্ ছিলেন। তিনি মুন্সেফ বাবুর অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাঁচকড়ি বাবু আমাদের আদর্শ, এই বাগানবাড়ী আমাদের নন্দন। তোমরা সকলে রিটার্ণ টু নেচার—অর্থাৎ স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করহ। প্রকৃতি উলঙ্গিনী, স্বয়ং শ্যামা মা উলঙ্গিনী, আমরাও তাঁর উলঙ্গ সন্তান। অতএব—"

"সিদ্ধান্ত ঠিক হইল না" বলিয়া প্রোফেসার সেন সেখানে উপস্থিত হইলেন ও কাণ্ড দেখিয়া লজ্জায় অবনত মুখে বলিলেন, 'ছ্যাঃ!' যাই "ছ্যাঃ!" বলা অমনি রায় সাহেব বলিলেন, "বেরোও, বেরোও—এটা তোমার মর্যালিটির জায়গা নয়, বেয়াদব! জানই তো কি হবে। তবে এখানে এসেছ কেন বাপু? নাচ গাও, নইলে নড়ো না, চুপ ক'রে ব'সে থাক, এই দেখ পিস্তল ভরা!"

সকলে তখন উন্মত্তপ্রায়। বেগতিক দেখিয়া প্রোফেসর সেন একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এ চড়িভাতি, না কেয়স্,—"কন্‌ফিউসন ওয়ার্স কনফাউণ্ডেড্।"

ইতিমধ্যে মিঃ লোড়ি ও তিনকড়ি বাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন কক্ষান্তর হইতে অন্যতম যুগল আসিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা গায়িলেন, "কে পোয়াতি রসবতী খোলা নিবি আয় লো।" সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ রুচিবিগর্হিত অঙ্গভঙ্গী। তৎপর সম্মার্জ্জনীহস্তে তাঁহারা গায়িতে লাগিলেন, "এমন ক'রে হতাদরে রেখেছে বাগান" ও সত্বরই "ঝেঁটিয়ে কত রাখ্‌ব, হাতে ব্যথা ধরেছে" গায়িতে গায়িতে পরস্পরে ঝাঁটাঝাঁটি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এমন সময়ে বাঈজি সেখানে উপস্থিত হইল। উকীল গোষ্ঠবিহারী তখনি "ট্রেস্‌পাস" "ট্রেস্‌পাস" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। মিঃ লোড়ী বলিলেন "ডিস্‌এলাওড্‌,—এস বাঈজি, এস!"

বাঈজি একটা গান গায়িবার পরই পাত পড়িল। পাতে পাতে ভট্টাচার্য্যের রাঁধা পাখী বিশেষের রোষ্ট, চপ্‌-কাট্‌লেট,—পোলাও, খুরিতে খুরিতে কোর্ম্মা-কালিয়া-দই-রাবড়ি, সরায় সরায় মেঠাই মণ্ডা, ফল প্রভৃতি দেওয়া হইল। বাবুদের কেহ আসনে বসিলেন, কেহ এক গ্রাস ভাত মুখে দিলেন। ডেপুটি লোড়ী প্রোফেসার সেনের হাত ধরিয়া অভিনয়ের সুরে বলিতে বলিতে আসিলেন, "প্রিয়তমে, তোমার জন্য আমি না করিতে পারি কি? অনলে জীবন আহুতি, সাগরে প্রাণবিসর্জ্জন, যূপকাষ্ঠে গলদেশপ্রদান, সব করিতে পারি।" সেন মহাশয় বলিতেছিলেন, "আপাততঃ অতটার প্রয়োজন দেখ্‌চিনে, গরম গরম চাট্টি আহার কর্‌লেই চল্‌বে।"

এমন সময়ে চারিদিক হইতে সহসা প্রেতের বিকট হাস্য শ্রুত হইল ও তার পর একটা, দুইটা করিয়া অনেকগুলি ভূত অনুনাসিক শব্দ করিতে করিতে সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন "যঃ পলায়তি স জীবতি," পালা-পালা—ছুট্‌ ছুট্‌—রোল পড়িয়া গেল। এ উহার ঘাড়ে, ও উহার পিঠে পড়িয়া বাবুরা কোনমতে পরিপাটিরূপে চম্পট দিলেন।

লোড়ীকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, হয়েছে কি?" লোড়ী বলিলেন, "হবে আর কি, তোমার সীঁথের সিন্দুর এ যাত্রা কোন মতে থেকে গেল। করমচাঁদের বাগানবাড়ী হাণ্টেড্‌ তা জান্‌তুম না। বাপের শক্তি থাবায়,

সাপের শক্তি দাঁতে, কুমীরের শক্তি ল্যাজে, ভেড়ার শক্তি শিঙ্গে, কুকুরের শক্তি গলায়, আর ভাগ্যিস্ আমাদের শক্তি পায়ে, তাই তোমার প্রাণনাথকে আবার ফিরে পেলে, নইলে—”

গৃহিণী। খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?

লোড়ী। একদম না।

বাড়ীর সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপে বাজার হইতে মিঠাই আনিয়া ডেপুটি বাবু সে রাত্রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। দুর্দ্দশা আর সকলেরও একইরূপ হইয়াছিল।

ডাক্তার বাবুর আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি বাগানবাড়ীতে ঢুকিয়া দূর হইতে দেখিলেন, সেখানে বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, বিষম ব্যাপার,—মেঝের উপর ভূতের মুখোষ, মড়ার খুলি। ও কি, ও খাচ্চে কারা ? গায়ে মুখে কালি এরা কে ?—বাঃ, বাঃ, এরা যে আমাদেরই ফট্‌কে, সুশীল, সুবোধ, প্রবোধ, গিরীন, নবীন, নলিন, বিপিন ! ওঃ বুঝেছি, এই ছোঁড়ারাই আজ আমাদের রসভঙ্গ করেছে।”

সেখানে আর অপ্রতিভ হইবার জন্য মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া ডাক্তার বাবু বুদ্ধিমানের মত শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া পড়িলেন।

এদিকে ভূতেরা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া আসরে বসিয়া বাঈজিকে হুকুম দিল, “নাচ বাঈজি, আমোদ ইয়ার্কি আমাদের মত ইয়ং মেনের জন্য, বুড়ো ব্যাটাদের জন্য নয়।”

স্পর্শমণি

রমাকান্ত বাবুর দেহত্যাগের পর দেখা গেল,—যে সকল নিষ্কুলীন ধনবলে কুলীন হইয়া বিনামাগুটি কাটিয়া কলিকাতা সহরে বাহির হইয়াছেন তিনি তাঁহাদের ঝাঁকে মিশিয়া মানবজন্ম সার্থক করিয়া গেলেও পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই, 'অরক্ষণীয়া' কন্যা সুধার বিবাহোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই, —এমন কি তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলান হওয়াই দুষ্কর। অথচ লোকে তাঁহাকে ধনশালী মনে করিয়া তাঁহার কোম্পানির কাগজের মূল্য এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমানতি টাকার পরিমাণ লইয়া কত ব্যর্থ অনুমান করিত। নিজের আয়ুঃ ও বুদ্ধি এবং পরের অর্থ কে কবে কম দেখিয়া থাকে ?

যাহা হউক, শীঘ্রই প্রকৃত কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিপন্না বিধবা হিরণ্ময়ী কন্যা সুধার সহিত যখন রমাকান্ত বাবুর বন্ধুবান্ধবগণের দ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন কেহ 'বাড়ী ছিলেন না' বা থাকিয়াও দেখা করিবার সময় পাইলেন না,—বাবুটি বড় ব্যস্ত; কেহ বা অপরিণামদর্শিতার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন,—পতিনিন্দাশ্রবণে অভাগিনী কর্ণে অঙ্গুলী দিলেন; বন্ধুঘরণীগণ সম্মুখে 'বাপু,' 'বাছা,' 'আহা' বলিয়া তাঁহাকে

শুভইন্দু শীঘ্র বিদায় দিয়া নেপথ্যে শ্লেষের বাণ হানিলেন,—হিরণ্ময়ী যাইতে যাইতে তাহা শুনিতে পাইলেন।

কোনরূপে শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে হিরণ্ময়ী দেখিলেন, পৈত্রিক ভদ্রাসনবাটী সংস্কারাভাবে জীর্ণ, তৃণগুল্মাদিপূর্ণ.—সেখানে বাস অসম্ভব। জোত ব্রহ্মোত্তরও নাই। কিসে দিন চলিবে ভাবিতে ভাবিতে তিনি অসময়ের বন্ধু এক দূরসম্পর্কীয়া পিসীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিসীর কিছু অর্থ ছিল।

সেকালের পিসী দাঁতে মিশি দিতেন, একালের মত দোক্তা খাইতেন না; সোজাসুজি মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, সম্মুখে এক গাল হাসিয়া নেপথ্যে কুৎসার হাট বসাইতে জানিতেন না। কাজেই তিনি সম্পূর্ণ সেকালের ভাবে বলিলেন, "এসেছ, বেশ করেছ, মা! আমার এই বুড়া বয়সে তোমরাই অন্ধের নড়ি। ভেবেছিলাম, তোমাদিগকে আসিতে লিখিব। কিন্তু কি মনে করিবে ভেবে কিছু লিখিনি। এসে বেশ করেছ মা! আমি কি তোমাদের পর? এ বাড়ী তোমাদেরই মনে করিও।"

২

পিসীর বাড়ী কল্যাণপুর। তখন সে গ্রামটি এক নবীন ব্রহ্মচারীর শুভাগমনে মুখরিত। তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য বালক বৃদ্ধ ও রমণীদিগের আগ্রহ কত! ব্রহ্মচারী সদানন্দের হোমানলশিখার ন্যায় দীপ্ত অবয়ব, সঙ্গীতকলায় অনন্যসাধারণ অধিকার, মিষ্ট অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা। গ্রামের চতুর্দ্দিক হইতে দর্শনাভিলাষী লোক জুটিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা তাঁহার নিকট পরমায়ুঃ ও শক্তিবৃদ্ধির ভেষজ

চাহিয়া লইল, রমণীরা মৃতবৎসার বা বাধকের ঔষধ বা নিরুদ্দিষ্ট বালকের সংবাদ লইল, স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা গীতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝিয়া লইল। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি শুধু দেখিতেই আসিল। পাষাণের দেবতার নিকট লোকে বর চাহিয়া পায়, সদানন্দ তো মানুষ। কাজেই কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় নাই।

সদানন্দ 'আপটুডেট্' ব্রহ্মচারী। এরোপ্লেন যে আমাদেরই পুষ্পক রথ, প্রথম 'বেলুনিষ্ট' যে রামদাস হনুমান, ইত্যাদি অনেক আবিষ্কার তিনি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেন। নানা মহাপুরুষবচন নিজস্ব করিয়া বলিতে তাঁহার দক্ষতা অসামান্য। ইহা তো জ্ঞানবিভাগ। সদানন্দের প্রধান শক্তি সঙ্গীতে। সুমিষ্ট গীত গাহিতে তাঁহার মত আর কেহ পারিত কিনা সন্দেহ। যেমন চেহারা তেমনি গলা। নিত্য প্রশংসার ঢেউ বহিতে লাগিল। শুনা যায়, কেবল সঙ্গীতের দ্বারা তিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকার করিতেন। সে অসাধ্যসাধনে লোকে আরও বিস্ময়াবিষ্ট ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত।

হঠাৎ একদিন সদানন্দ হিরণ্ময়ীর পিসীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার বাড়ীতে দিন কয়েকের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। লোকের ভিড় আর ভাল লাগে না বলিয়া সদানন্দ কিছুদিন সেখানে নিভৃত সাধনায় রত হইলেন। কাহারও সহিত সহজে কথা বলেন না, কোন প্রশ্নের উত্তর দেন না। তাঁহার তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া দলে দলে লোক ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

ধ্যানস্থ সদানন্দ মধ্যে মধ্যে তাঁহার একটি গীত সুকণ্ঠে গায়িতেন,—

নিশিদিন নাথ, রহ সাথ সাথ,
তৃষিত এ চিত তোমারে চায়,
তোমারে চায় !
তুমি এস এস, হৃদাসনে বস,
ঠেলোনা অধীনে ঠেলোনা পায়,
ঠেলোনা পায় !
পিয়াসী চাতক চাহে প্রেমবারি,
সে বারিতে দাও অশ্রু নিবারি',
আমি যে তোমারি প্রেমের ভিখারী,
রাখ হে আমারে তব প্রেমছায়,
তব প্রেমছায় ।

ঠাকুরঘরে (সদানন্দের কক্ষে) সেবার্থে কেবল পিসী ঠাকুরাণী, হিরণ্ময়ী ও সুধার গতায়াত ছিল। আর সকলেরই সেখানে 'প্রবেশ নিষেধ'। রমাকান্ত বাবু আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মে যেমন বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তাঁহার স্ত্রী হিরণ্ময়ী উহাতে তেমনই পরম আস্থাবতী। দেবদ্বিজে ও সাধু সন্ন্যাসীতে তাঁহার অপরিমেয় শ্রদ্ধা। কাজেই ষোড়শোপচারে ব্রহ্মচারীর পূজা চলিতে লাগিল।

৩

সুধা পরমা সুন্দরী। তাহার ভিতর কোরকের পেলবত্ব ও ফুল্লকুসুমের কমনীয়তা উভয়ই বিদ্যমান,—তবে কোরকতারই যেন বেশী। সে ক্রীড়াশীলা, অথচ যেন তরুণীর মত কিছু ব্রীড়াশীলা। কিশোরী যৌবনের নবোন্মেষ যেন বুঝে বুঝে বুঝে না ;—আধ আধ, বাধ বাধ বাঁধ মানে না

ভাব, সঙ্কোচ অসঙ্কোচে কেমন এক মনোমদ মিলন! কি তরল সৌন্দর্য্য, সরল হৃদয়, চঞ্চলগতি, উছলিত লাবণ্য!

একদিন সন্ধ্যাকালে সদানন্দ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে কৃষ্ণাজিনে সমাসীন। বোধ হয় যোগমগ্ন। তবু দিব্যদৃষ্টিবলে তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না, সুধা সে কক্ষে একাকিনী আপন মনে ধূনুচির আগুনে ফুঁ দিতেছে ও তাহাতে তাহার স্বভাবরক্ত গণ্ডদুটি দাড়িম্ব পুষ্পের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তখন ব্রহ্মচারী সদানন্দ চিদানন্দসহকারে ধ্যানস্থ ভাবে অতি মৃদু অথচ সুস্পষ্ট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "হরি হরি, কি দেখিলাম! কেন দেখিলাম? আনন্দময়ী রাধার রূপে কক্ষ সমুজ্জ্বল! 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' কেবল আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ। রাধে, আনন্দরূপে বিরাজ করিয়া জন্ম জন্ম আমায় আনন্দ বিতরণ কর, আমার ছার জন্ম সফল হোক। আনন্দস্বরূপিনী রাধা, তুমি যে আমারই অন্তরে বাঁধা।" শুদ্ধ ভাষায় গ্রথিত রাধাস্তব বালিকা সুধা কি বুঝিবে? বিশেষতঃ ঠাকুর অন্তর্দৃষ্টিবলে কত অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেন ও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ধ্যানকালে কত নিগুঢ়তত্ত্ব প্রাঞ্জলভাবে প্রকট হইত তাহা ভক্তিভিক্ষুরাই সকল সময়ে বুঝিতে পারিত না। সুধা পূর্ব্ববৎ আগুণে ফুঁ দিতে লাগিল। সদানন্দের আনন্দ আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহার ভাষা স্পষ্টতর হইতে লাগিল। এবার তিনি অত্যন্ত সরলভাবে বলিলেন, "এই সে বিপিন, রাধারূপে সুধা আমার বামে বসিয়া প্রেমক্ষুধা মিটাইতেছে। সুধা—তুমি আমার রাধা,—আমার অঙ্গের আধা—অন্তরে অন্তরে বাঁধা।"

বালিকা তখন "মাগো!" বলিয়া অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া ঠাকুর

ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। হিরণ্ময়ী "কি হয়েছে মা, কি হয়েছে ?" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। সুধা কাঁদ-কাঁদ ভাবে ঠাকুরের ভাব-সমুদ্রোত্থিত কয়েকটি কথা কোনমতে বলিয়া ফেলিল। তাহাকে ঠাকুর ওরূপ কথা কেন বলিলেন কহিয়া সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কন্যাকে বুঝাইলেন, "ঠাকুর ভাবাবেশে কি বলেছেন তার মানে হয়ত বুঝতে পারিস্ নি মা!" পিসী ঠাকুরাণী সকল ব্যাপার জানিয়া বলিলেন, "না, সুধা ঠিক্ বুঝেছে। ব্বেটা একটা ভণ্ড !" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতগতি সম্মার্জ্জনীহস্তে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সদানন্দ সুবুদ্ধির ন্যায় সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার দণ্ড, কমণ্ডলু ও কৃষ্ণাজিন পড়িয়া আছে।

এই বিষয় লইয়া গ্রামে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যাইত। কেবল পিসী ঠাকুরাণীর বুদ্ধিমত্তায় সকল কথা চাপা পড়িল। তিনি সদানন্দের দণ্ডাদি জলে ফেলিয়া দিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, "ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন।"

সদানন্দের ভক্তগণ তাঁহার অন্তর্ধানে অকৃপার লক্ষণ জ্ঞানে অশ্রুপাত করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "প্রভু আমাদের পাপে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মঠে ফিরিয়া গিয়াছেন।"

৪

এদিকে সুধা শশিকলার মত দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সে চৌদ্দ হইতে পনের বছরে পড়িল। কলা পূর্ণের বাকি কি ? পঞ্চদশীতে চন্দ্রের পূর্ণকলা—পৌর্ণমাসী, উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীরও পঞ্চদশে রূপলাবণ্যের পরিণতি।

কথায় বলে, নারীর শত্রু রূপ। সুধা সুন্দরী। তাহার [illegible] না জুটিবে কেন? সদানন্দ ব্যতীত গ্রামের সাড়ে সতের গণ্ডার মালিক বৃদ্ধ জমিদার কৃতান্ত বাবুর নজরও সুধার উপর পড়িয়াছিল। তিনি কিশোরীর সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া ও লোকমুখে সর্ব্বদা তাহার অতুল রূপের বহুল প্রশংসা শুনিয়া সহসা পঞ্চম পক্ষ আলোকিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ঘটকের দ্বারা কন্যার মাতার নিকট সেই শুভ প্রস্তাব উথাপনও করিলেন। হিরণ্ময়ী চিন্তা করিয়া পরে আপন অভিমত জানাইবেন বলিয়া ঘটককে বিদায় দিলেন। হউক না কেন কেশ শুক্ল, চর্ম্ম লোল, কৃতান্ত নিকট, কৃতান্ত বাবুর হৃদয় নিতান্ত তরুণই ছিল। তিনি একদিন লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বয়ং হিরণ্ময়ীকে কহিলেন, "আমাকে আপনার কন্যারত্ন উপঢৌকন দিন।" পিসী ঠাকুরাণী নিষ্করুণ ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে নিরাশপ্রাণে বিদায় দিলেন।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "সুধার সম্বন্ধ কোথা হ'তেই আস্‌চে না। ইনি এই গ্রামের জমিদার, টাকাকড়ি নেবেন না।"

পিসী। আর, বয়স কম, নবীন যৌবন, খাঁটি বলিদান! হউক অবস্থাপন্ন, তাই বলে মুমূর্ষুর হস্তে একমাত্র কন্যা সমর্পণ করিবার নির্ম্মম ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান দিবে?

হিরণ্ময়ী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে থাক্। কিন্তু বর কোথায়? সামর্থ্য কোথায়?

পিসী। ভগবান জোটাবেন! সুবিধাও তিনিই ক'রে দেবেন।

৫

প্রত্যাখ্যানে হতজ্ঞান, প্রজার সাক্ষাৎ যম, কৃতান্ত বাবু সুধাকে

বৈধভাবে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিতে অক্ষম হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। নানারূপ ভীতিপ্রদর্শনেও যখন কোন ফল হইল না তখন তিনি বক্র পথ অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

মাহেশের রথ। হিরণ্ময়ী সুধাকে লইয়া নৌকাযোগে রথ দেখিতে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে আর একখানি নৌকা নিশাকালে তাঁহাদের পিছু লইল ও সহসা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিতে না দেখিতে মাতাপুত্রী শ্যেনধৃতা কপোতীর মত দ্বিতীয় নৌকায় নীতা হইলেন। পাষণ্ডেরা অভাগিনীদের মুখ হাত বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে কৃতান্ত বাবু একটি ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মবিবাহে যখন আপনাদের অমত, তবে আসুর বিবাহই হউক।"

সুধা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে চাহিল, কিন্তু মুখ বাঁধা ছিল বলিয়া পারিল না, নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ীরও সেই অবস্থা। তিনি আগে মনে করিয়াছিলেন কোন ডাকাতের হাতে পড়িয়াছেন। কিন্তু কৃতান্ত বাবুর কণ্ঠস্বরে তাঁহার ভ্রম ঘুচিল। ডাকাইত হইতেও দুর্দ্দান্ত কৃতান্ত তাঁহাদের সম্মুখে!

কৃতান্ত বাবু কহিলেন, "পুরোহিত সঙ্গে আছে। আজ রাতে এই ঘাটেই বিবাহ হইবে। দিন আছে।"

ঘাটে?—অন্তর্জ্জলি না বিবাহ?

এতক্ষণে মা ও মেয়ের মুখের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল।

সুধা বৃদ্ধের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ষা করুন, আপনি আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা।"

কৃতান্ত নাতনী হইলেও আজ রক্ষা নাই।

সুধা তার পর 'হে ভগবান্!' বলিয়া গঙ্গাবক্ষে হঠাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেই সময়ে এক খানি ছিপ্ তীরবেগে ঐ দিক দিয়া যাইতেছিল। তাহার প্রধান আরোহী পূর্ব্বোক্ত পান্সী হইতে একজন স্ত্রীলোককে জলে পড়িতে দেখিয়া চকিতের মধ্যে তাহাকে তুলিয়া লইলেন।

তারপর সুধার উদ্ধারকর্ত্তা ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া অনুচরবর্গের সহায়তায় কৃতান্ত বাবুকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে ও হিরণ্ময়ীকে আপনার ছিপে আনিলেন। মাতাপুত্রী এইরূপ দৈবোপায়ে রক্ষা পাইয়া বারংবার নারায়ণকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সুধা দীপালোকে সভয়ে দেখিল, তাহার উদ্ধারকারী—ব্রহ্মচারী সদানন্দ।

সুধা ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল, "হে নারায়ণ, হে বিপদভঞ্জন, আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাতক করিয়াছি, দেব, যে এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে আর এক বিপদের মুখে পড়িলাম? হায়, হায় পোড়া রূপই আমার কাল।"

সুধার সচকিত দৃষ্টি দেখিয়া সদানন্দ কহিলেন, "কোনও ভয় করো না, সুধা! আমা হতে তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না।"

ব্রহ্মচারী তৎপর কৃতান্তের কেশাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "বুড়ো ব্যাটা, শীগ্‌গির বল্, তুই কেন একাজ কর্‌লি?" বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতেই বিষম প্রহার আরম্ভ হইল। অবশেষে হতভাগ্য সকল কথা খুলিয়া বলিলে সদানন্দ অনুচরগণের প্রতি আদেশ করিলেন, "ইহাকে হনুমান সাজাইয়া দাও।"

"অনুচরেরা কৃতান্তের মাথায় আলকাতরা ঢালিয়া দিল, মুখে কালি মাথাইল ও একটি বৃহৎ লাঙ্গুল জুড়িয়া দিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব বেশ পরাইল। কৃতান্ত বাবুর কাকুতি মিনতিতে কেহ কর্ণপাত করিল না। ছিপে ব্যঙ্গ ও উচ্চ হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। এক ব্যক্তি বৃদ্ধের হাতের দড়ি ধরিয়া তাঁহাকে নাচাইতে লাগিল।

হনুমান হিরণ্ময়ী ও সুধার পা জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল, "মা তোমরা এই বৃদ্ধ সন্তানকে রক্ষা কর !"

নারীজাতির কোমল হৃদয় স্নেহ করুণায় ভরা। হিরণ্ময়ী সদানন্দকে বলিলেন, "প্রভু, এঁকে ছেড়ে দিন্। ঢের সাজা হয়েছে !" তিনবার নাকে কাণে খৎ দিয়া কৃতান্ত অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু আলকাতরার পোঁচাড়া অপ্রত্যাশিত মনুষ্যসঙ্গ সহজে ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না।

সুধারা কল্যাণপুরে পঁহুছিলে সাড়ে সতের গণ্ডার মালিক, জমিদার কৃতান্ত বাবু বলিলেন, "বাপ্‌রে, সুধাদের সঙ্গে লইয়া আসিতে নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছিল। ঠাকুর সদানন্দের ও আমার লোকজনের সাহায্যে কোনমতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাকাতেরা আমার যে দুর্দ্দশা করিয়াছে তাহার কিছু নমুনা এখনও মাথায় রহিয়াছে।"

৬

সুধার সম্বন্ধ কোথাও স্থির হয় না। হিরণ্ময়ী প্রমাদ গণিলেন। একে সৎপাত্র মেলাই দায়, তায় বর মেলে তো ভাল ঘর মেলে না, সব মেলে তো টাকার সংস্থান হয় না।

এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

ভগবান্ অনাথবৎসল। সুখদুঃখ চক্রনেমির মত পরিবর্ত্তনশীল। কিছু দিন পরে কষ্টের মেঘ কাটিবার উপক্রম হইল।

এক দিন ডাকপিয়ন হিরণ্ময়ীর হস্তে একখানি চিঠি দিয়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল,—

শ্রীদুর্গা সহায়।

কোন্নগর,
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩১২

মহামহিমাসু,

আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও আমি ৺ রমাকান্ত বাগচি মহাশয়কে বিশেষরূপে জানিতাম। আমাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমি আপনাদের কলিকাতার বাসায় দুই একবার পূর্ণ পরিতোষের সহিত আহারাদি করিয়াছি। কাজেই আমি আপনাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নহি।

শুনিয়াছি, রমাকান্ত বাবুর একটি সুন্দরী কন্যা আছে, সে এখন প্রাপ্তবয়স্কা। তাহার কোথাও সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে কি না লিখিবেন। আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। পণ, গহনা, লৌকিকতা, বারবরদারি প্রভৃতি বাবদ কিছু লইব না। কারণ, বহুকাল হইতেই আমি এইরূপ অন্যায় উৎপীড়নের বিরোধী। বিশেষ, ভগবানের কৃপায় আমার বিষয়সম্পত্তিও কিছু আছে। অনুসন্ধান করিলে আমার বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি সকল বিষয়ে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসন্ন আমার একমাত্র সন্তান। সে এফ, এ পর্য্যন্ত

পড়িয়াছে। এখন আমাদের পৈত্রিক ব্যবসায় দেখে শুনে। সে এত দিন বিবাহ করিতে সম্মত ছিল না, সম্প্রতি রাজি হইয়াছে।

পত্রোত্তরে আপনার অভিমত জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। এখানকার মঙ্গল। আগামীতে আপনাদের কুশল সংবাদে সন্তোষিবেন। নিঃ ইতি—

নিবেদক

শ্রীতারাপ্রসন্ন চৌধুরী।"

সুধার মার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। যেমন-তেমন বর চাইতে একেবারে এমনতর!

পিসী ঠাকুরাণী কহিলেন, "হিরণ, বলিনি সুধার জন্য ভেব না, মাথার উপর ভাবিবার মালিক আছেন?"

৭

ধূমধামের সহিত সুধার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু বর বোধহয় তাহার পছন্দ হইল না।

বিবাহ জীবনের নববসন্ত; সে বসন্তের আগমনে পিক নিত্য কুহু কুহু করে, শীতল মলয় নিত্য সৌরভ বিতরণ করে। তাহার প্রথম সন্দেশবহ দম্পতির শুভদৃষ্টি।

কিন্তু সুধা এইরূপ শুভক্ষণে, শুভদৃষ্টির সময় প্রায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে মনে করিয়াছিল, বালিকা অনাহারে অবসন্না হইয়া পড়িয়াছে।

এমন ঘর বর কজনার ভাগ্যে মিলে? তবু সুধা সুখী নয়, বরং দুঃখে ম্রিয়মানা। কেন, তাহার দুঃখ কিসের?

স্নেহের ঋণ

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামিস্ত্রীর প্রথম সম্ভাষণের সময় সুধা পতিকে কহিল, "দুইটি অসহায়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার লাভ কি হইল ?"

পতি। সুদূর কাননের ভিতর লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি পারিজাত ফুটিয়াছিল, তাহা তুলিয়া ঘরে আনিয়াছি। ইহাতে সর্ব্বনাশের কথা কি, সুধা ?

সুধা। আমাদিগকে আপনি প্রতারণা করেছেন !

পতি। কোনরূপ প্রতারণা করিনি। সুধা, তোমার দেবী-প্রতিমার মত রূপ দেখিয়া আমার মোহ টুটিয়াছে, প্রাণের ভিতর সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগিয়াছে। কেবল দুদিনের জন্য পথহারা হয়েছিলাম, আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। সে তোমারই কৃপায়, সুধা !

সুধার দৃষ্টিতে অবিশ্বাসের হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

তাহা দেখিয়া বর পুনরায় বলিলেন, "সংশয় করিও না, সুধা ! আমি তোমার কাছে কিছু লুকাইব না। আমার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া যাও।"

একে একে কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার পূর্ব্বেতিহাস বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সে বর্ণনায় সুধার বিশ্বাস হইল। অবশেষে স্বামী বলিলেন, "শুন সুধা ! প্রেম স্পর্শমণি। আপনা-হারা আমি তাহারই বলে আমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি ও দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের এবং দশের কাজ করিতে পারিতেছি।"

সুধা। ব্রহ্মচর্য্যের এত উদ্যোগপর্ব্বের পর অবশেষে নারীপর্ব্ব ?

পতি। কেমন, আমার কথা ফলিল না, সুধা? আমি কৃষ্ণ, তুমি রাধা, তুমি আমার অঙ্গেরই আধা, অন্তরে অন্তরে বাঁধা।

সুধা নিঃসংশয়ে বুঝিল ব্রহ্মচারী সদানন্দ তাহার স্বামী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন চৌধুরী, বরাকর কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, বিপুল ধনী, রায় বাহাদুর তারাপ্রসন্ন চৌধুরীর একমাত্র পুত্র।

একচক্ষু।

১

সন্তোষ অভাবের মুখাপেক্ষী নহে। তাই দীনতার নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও, নানা অভাবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও একচক্ষু মাণিক হৃষ্ট, তৃপ্ত ও স্বল্পে সন্তুষ্ট। কোন 'হাই' স্কুলে না পড়িলেও সে প্রকৃতির স্কুলে কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিল। তজ্জন্য সে চিরদিন সত্য, সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের পিপাসু। তাহার অবয়বে বা আয়ে লক্ষ্মীর কৃপা-কটাক্ষ লক্ষিত না হইলেও, মস্তিষ্কে বিদ্যালয়ের বাগ্দেবীর কৃপা প্রকটিত না হইলেও ভগবান্ তাহার মনটা ভাল করিয়াই গড়িয়াছিলেন ; জগতের ভাল মন্দ দুই দিক দেখিবার জন্য দুই চক্ষু না দিলেও তাহার ভাল দিকের চক্ষুটা কাণা করেন নাই।

বয়োবৃদ্ধি নিজের হাতে নয়। তবু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উপার্জ্জনক্ষম না হইলে গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। মাণিকের পক্ষে এ বিধানের ব্যতিক্রম হইবার কারণ ছিল না। অনেক লাঞ্ছনার পর সে চাকরীর চেষ্টায় বিরত হইয়া ব্যবসায়ে মন দিল। কিছুদিন রেড়ীর চাষে অদৃষ্টপরীক্ষার পর সে স্থির করিল, শূকরের ব্যবসায়ে ১০০৲ টাকা মূলধন লইয়া বসিলে পাঁচ বৎসরে ৭১১২।৶৭ পাই লাভ সুনিশ্চিত! কিন্তু কেবল জল্পনার ঊর্ণা বয়ন করিয়া কে কবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়াছে? অতএব মাণিকের এবারও হার হইল।

ভগবান্ কাহাকেও একেবারে কাঙ্গাল করেন না। মাণিকের সকল

সম্পদ তাহার কণ্ঠে। ঐ যন্ত্রটির সাহায্যে সে প্রায়ই কোন না কোন 'পার্টি'তে বা 'পিকৃনিকে' আমন্ত্রিত হইত। ক্রমে মদনগঞ্জের সঙ্গীত-রসিক জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন রায়চৌধুরীর সহিত তাহার পরিচয় হইল। সেই হইতে তাহাকে দগ্ধোদর-পূরণের জন্য বিচলিত হইতে হইত না। এখন সে নিশ্চিন্তমনে 'দ্বিগুণ খায়, দেড়গুণ ঘুমায়।' চরকের মতে, অতিনিদ্রায় মেদবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তদুপরি নিত্য চর্ব্ব্য চোষ্যলেহ্যপেয়াদি ভোজন ও অলসভাবে জীবনযাপন! অগৌণে মাণিকের উদরদেশ তাহার তানপুরার আকার ধারণ করিল।

২

রায় বাহাদুর রমণীরঞ্জন দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন হইল মদনগঞ্জের সব ডিভিসন্যাল অফিসার হুল সাহেবের বিষনয়নে পড়িয়াছেন। কুলোকের চক্রান্তেই হউক, অথবা যথারীতি মন যোগাইবার ত্রুটিতেই হউক, শ্রীযুতকে অনেক ঘুরপাক খাইতে হইতেছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কেবল বাক্যের ফুলঝুরিতে কল্পনার অগ্নিময়ী লীলা দেখাইয়া 'বয়কট্' ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া আইনের সীমা কিছু অতিক্রম করিয়াছিলেন। সেই হইতেই সকল অনর্থের সৃষ্টি। তজ্জন্য উক্ত 'স্বদেশী' পুত্রকে বর্জ্জন করিবার অঙ্গীকার করিয়াও রায় বাহাদুর নানারূপ লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। হুল সাহেব মদনগঞ্জে থাকিতে দেশে না থাকাই বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবগণের পরামর্শসিদ্ধ হওয়ায়, তিনি অবিলম্বে সস্ত্রীক ও সগভর্ণেস দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। জমিদারীর ভার নবনিযুক্ত ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের হাতে রহিল! ইহাও কম সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় নহে। পাছে জমিদারী লইয়া বিব্রত হইতে হয়,

তজ্জন্য বিপদের কাণ্ডারী 'উপযুক্ত' ম্যানেজার বাহাল করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বিলাতী গভর্ণেস?—সে তো বড়লোকের পোষাকী সখ। যেমন খেতাব চাই, 'মোটর' চাই, 'অনারেবল' হওয়া চাই, তেমনি একটি গন্ধবতী গভর্ণেসও চাই।

৩

মে মাস। দার্জ্জিলিঙ্গের প্রভাতশোভা বড় সুন্দর, বড় রমণীয়। হিমাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে ও সানুদেশে শ্যামসৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত। পশ্চাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুঙ্গ শৃঙ্গে তুষারপুঞ্জ মরীচিমালীর কনককিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত। হীরকস্তূপে হেমচ্ছটা বিকীর্ণ। নবযৌবনপুষ্পিত প্রকৃতির হাস্যময় উচ্ছ্বাসে হিমানীর জড়তা দূরীভূত হইয়াছে। সেই সঙ্গে মানুষের মনও আনন্দময়, সঙ্গীতময় হইয়াছে। জগৎ নবোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

অনঙ্গ কাহার প্রতি কখন ফুলশর নিক্ষেপ করেন, কে জানে? মাণিক একে 'নেটিভ', তায় একচক্ষু, কৃষ্ণকায়, নির্ধন। দুই-চক্ষুমতী 'গভর্ণেসে'র কৃপাই বল, আর অনুগ্রহই বল, উহা লাভ করিবার কোন গুণই তাহার ছিল না, সে আশাও ছিল না। তবু গ্রহের ফেরে মাণিকের চিত্ত নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে প্রভুর যুবতী গভর্ণেসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এক দৃষ্টে সন্দর্শন, অদর্শনে তদ্গতচিত্তে ধ্যান। এ ভালবাসা 'ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে'। যাহা হউক, ক্রমে মাণিকের নিদ্রা গেল, ক্ষুধা গেল; অতএব মেদেরও হ্রাস হইল। গরীবের রোগ ভগবান্ সারান।

গভর্ণেস মিস্ মেরীকে গৌরাঙ্গী বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে তিনি পাণ্ডুবর্ণা বলিয়া প্রতীয়মান হইবার জন্য প্রত্যহ 'টয়লেটে' যে

প্রাণান্ত শ্রম করিতেন না, এ কথাও বলা যায় না। মিস্ মেরী খাঁটি 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্' কি না, সে মীমাংসার ভার পাঠকপাঠিকাগণের উপরই রহিল। রায় বাহাদুরের বিলাসবাগানে অনেক কুসুম ছিল। তাহাদের প্রায় সকলগুলিই পলাশ, কচিৎ দুই একটি যূথী বা শেফালিকা। মিস্ মেরী কাঠমল্লিকা। অঙ্গসৌষ্ঠবে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অপূর্ব্ব 'মডেল'।

ভালবাসি, অথচ যাহাকে ভালবাসি, সে তাহা জানিতে পাইবে না, ইহা কাব্য-জগতে সম্ভবপর হইলেও, বাস্তব-জগতে অসম্ভব। মাণিক যে তাহার ১৫৲ মাসহারা হইতে মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল ফুলের তোড়া কিনিয়া আনিয়া চুপে চুপে মেমসাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত, মিস্ মেরী ইহা লক্ষ্য না করিয়াছিলেন, এমন নয়। ইহা ছাড়া মাণিকের একচক্ষু যে সঙ্গোপনে তাঁহারই মুখমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া প্রায়শঃই স্থির হইয়া থাকিত, ইহাও তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন, মাণিক হতবুদ্ধি, অথবা প্রকৃতই চন্দ্রাহত। মিস্ মেরী একদিন খুসী হইয়া বেচারীকে একটা দু-আনী বকৃসিস্স্বরূপ মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। অভাগা তাহার উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া দুআনীটা টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

মাণিক প্রেমের রাশ টানিয়া ধরিতে চেষ্টা না করিত, এমন নয়। তবে সভাস্থলে 'বিবাহে পণ লইব না' বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়া যেরূপ, 'ভালবাসিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাও সেইরূপ। দুইয়ের কোনটাই কার্য্যকরী হয় না। অতএব মাণিকের মনে সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি সনাতন প্রথানুসারে মাথায় সামলা আঁটিয়া অনেকক্ষণ বৃথা তর্কবিতর্ক—সওয়াল

জবাব করিল। এ প্রেমে কেবল নৈরাশ্য, অবমাননার স্মৃতি ও বিপদের ব্যূহ। তবু অভাগার একচক্ষু সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শুধু ঐ রমণীমূর্ত্তিটিই খুঁজিয়া বেড়াইত।

অপরাহ্ণকাল। স্বাস্থ্যকামিগণ যুগলে যুগলে বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। প্রকৃতির শোভা ও রমণীর সৌন্দর্য্য পর্য্যাটকের নয়নে বিচিত্র গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মাণিক ইহার কিছুই লক্ষ্য না করিয়া মিস্ মেরীর অনুসরণ করিতেছিল। কখনও একটি সচকিত দৃষ্টি বা অর্দ্ধস্ফুট দীর্ঘশ্বাস তাহার অনির্ব্বাপিত প্রণয়-বহ্নি ব্যক্ত করিতেছিল। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, হৃদয়-দুর্গ অধিকারের কামনা নাই; মাণিক শুধু ভালবাসিয়াই সুখী।

কয়েক দিন হইল, সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী মধ্যে মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করেন। মিলনক্ষেত্র ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সন্নিহিত। মিশিবার রকম দেখিয়া ইহাদিগকে ভ্রাতাভগ্নী বা নিকট আত্মীয় আত্মীয়া বলিয়া বোধ হয় না; প্রেমিক প্রেমিকাও মনে হয় না। হয়ত ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার হিসাবে আদৌ দূষণীয় নয়। তবু মাণিকের ইহা ভাল লাগিত না।

আজ মিস্ মেরী একাকিনী বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা পীড়িতা। তাই গভর্ণেস তাহার সঙ্গে নাই। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উচ্ছ্বসিত বারিরাশি নিম্নদেশবর্ত্তী শিলাখণ্ডসমূহে গর্জ্জিয়া 'মুরছিয়া' পড়িতেছে এবং মুষ্টি মুষ্টি মুক্তারেণু বর্ষণ করিতেছে। মিস্ মেরা একাকিনী। আজ শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর সহিত মিলনের সুযোগ না ঘটায় তিনি ক্ষুণ্ণহৃদয়ে ফিরিতেছেন। এইভাবে বিষণ্ণহৃদয়ে তিনি

যখন ধীরে ধীরে কাকঝোরার পোলের কাছে আসিয়াছেন, তখন একখানা 'রিক্‌শ' তাঁহার গা ঘেঁষিয়া সবেগে চলিয়া গেল। মেম সাহেব পড়িয়া গিয়াছেন দেখিয়া 'রিক্‌শ'ওয়ালা প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পলাইল। মিস্ মেরী জ্ঞানশূন্যা, তাঁহার পার্শ্বে মাণিক!

বেচারী প্রাণপণে রমণীর চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। মিস্ মেরী একবার চাহিলেন, আবার চক্ষু মুদিলেন। মাণিক প্রমাদ গণিল। অবশেষে মিস্ সংজ্ঞালাভ করিলেন; কিন্তু সম্মুখে মাণিককে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তুমি এখানে কেন আছে?"

মাণিক। আপনার সেবার জন্য আছি।

মিস্। যাও, চলিয়া যাও; ধন্যবাদ!

মাণিক ভাবিল, ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে হয় ত যথেষ্ট। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরও কিছু নিদর্শন মাণিকের ভাগ্যে অবশিষ্ট ছিল। মিস্ মেরী 'রিক্‌শ'র ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেলে মাণিক পোলের নীচে তাঁহার 'পার্স' ও একখানি চিঠি কুড়াইয়া পায়। শেষটিতে কি আছে, জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া চিঠি ও থাম উভয়ই ফিরাইয়া দিবে ভাবিতে ভাবিতে সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় ক্ষীণকণ্ঠে গভর্ণেস ডাকিলেন, "বাবু! বাবু!" তখনও মিসের দুর্ব্বলতা আছে এবং মাথা ঘুরিতেছে ভাবিয়া, মাণিক তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আমার হাতের উপর ভর দিয়া চলুন।" ঘৃণায় মিস্ মেরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "রিক্‌শ বোলাও।" তাহার করস্পর্শে মেম সাহেবের পাউডার-ধূসর চর্ম্ম মলিন হইতে পারে, ইহা জানা ছিল না বলিয়া, সে মনে মনে আপনাকে

বারংবার ধিক্কার দিতে দিতে দূর হইতে একখানি 'রিকৃশ' ডাকিয়া আনিল। মিস্ মেরী গৃহে ফিরিলেন।

৫

কৌতূহলাবিষ্ট মাণিক অবসরসময়ে মিসের চিঠি পড়িতে চেষ্টা করিল। একে তাহার ইংরেজী ভাল জানা ছিল না, তাহার উপর সাহেবী ধাঁচের লেখা ভাল বুঝিতে না পারিয়া সে উহা রায় বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ত্রিলোচন বাবুর কাছে লইয়া গেল। ত্রিলোচন বাবু পত্র পড়িয়া অবাক্! তার পর মাণিকের কাণে কাণে কি বলিয়া তিনি রায় বাহাদুরের নিকটে গেলেন।

এদিকে মাণিক মেমসাহেবকে 'পাস' ফিরাইয়া দিতেই তাঁহার মুখ একেবারে কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি?"

মাণিক কহিল, "চিঠি তো আমার কাছে নাই।"

মিস্। ড্যাম ইউ!

কৃতজ্ঞতার অন্যতম উপঢৌকন লাভ করিয়া বিস্মিত হইয়া মাণিক বলিল, "মেমসাহেব, আমি আপনার চিঠি সন্ধান করিয়া দিব।"

মিস্। ডেভিল্! সাইক্লপ্!

মেরীর চক্ষু হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইতেছিল।

মাণিক চলিয়া গেল। এতদিন তাহার নিকট যাহা শুধু স্বপ্নময়, সৌরভময়, সঙ্গীতময়, শারদজ্যোৎস্নামণ্ডিত সুষমা মনে হইতেছিল, আজ তাহা রবিকরস্পর্শে শিশিরবিন্দুবৎ শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; অনাবৃত বাষ্পের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। হায় অদৃষ্ট!

যাহা হউক, ইহার পর রায় বাহাদুর তাঁহার ফ্লানেলজড়িত পা দুখানি কষ্টে ঠেলিয়া লইয়া, ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া, মিস্ মেরীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, "তে—তে—তেমন চোট লাগেনি তো? আজ আবার রিউম্যাটিজম্ বাড়িয়াছে। তবু আপনার অবস্থা জানিতে আসিলাম।"

মিস্ ভাবিলেন, তবে এ দীর্ঘকর্ণ কিছু জানিতে পারে নাই! প্রভুকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার জন্য মিস্ কহিলেন, "নো,—থ্যাঙ্কস্! বিশেষ কোনও আঘাত লাগেনি। আপনি বোধহয় আমাকে এখন একটু একলা বিশ্রাম করিতে দিবেন।"

আজ আর রায় বাহাদুর আহত সারমেয়ের ন্যায় সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি রুষ্টস্বরে কহিলেন, "বিশ্রাম?—চিরবিশ্রাম তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। যাক্,—মিস্ মেরী, তুমি এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও! তোমার নিজের জিনিসপত্র কিছুই নাই। একটা ট্রাঙ্ক সঙ্গে এনেছিলে; তা পোর্টার ষ্টেশনে দিয়া আসিবে। উঃ! কি ভয়ানক! তুমি এমন ঘৃণিত 'স্পাই'!"

ক্রোধে রায় বাহাদুরের কথাগুলি আরও জড়াইয়া যাইতে লাগিল। মিস্ মেরী কোনও উত্তর না দিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অপমানে তাঁহার কাণ দুটি যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শ্রীমতীর ঈষৎকৃষ্ণ ত্বকের ভিতর হইতেও সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

রমণীরঞ্জন আপনার কক্ষে ফিরিয়া গিয়া বহুদিনের উপেক্ষিত ভগবানকে স্মরণ করিলেন। ইহার পর মাণিক আসিল। তাহাকে

দেখিয়াই রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনি আমায় বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আজ হইতে আপনাকে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া আপনি ২০০৲ দুই শত টাকা পারিতোষিক পাইবেন। (প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রতি) দেখিলেন, আপনি ত্রিলোচন ও আমি দ্বিলোচন হইয়াও যাহা দেখিতে না পাইয়াছি, একচক্ষু মাণিক বাবু তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন!"

ত্রি। মাণিক বাবু বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। উনি আমাদের চক্ষুদান করিয়াছেন।

মাণিক সবিনয়ে জানাইল, "আমি বেতনবৃদ্ধি বা পারিতোষিক, কিছুই লইব না। আপনারা আমার অপরাধ লইবেন না।"

এমন সময়ে একজন দরোয়ান খবর দিল, মেমসাহেব চলিয়া গিয়াছেন।

পরদিন হইতে মাণিককে কেহ রায় বাহাদুরের বাড়ীতে দেখিতে পাইল না। দুই এক জন কহিল, তাহারা অভাগাকে মৃতের কবরের পার্শ্বচারী প্রেতের মত কাকঝোরার পোলের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। ত্রিলোচন বাবু কহিলেন, "মাণিক বাবুর প্রকৃতিটা যেন কেমন এক রকম! তাঁহার জীবনটাও হেঁয়ালির মত! তিনি ছায়ার মত আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।"*

এই গল্প ১৩২০ সালের "সাহিত্যে"র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

দায় থাকে, বেতন লয় না, খোকা যেমন তাঁহার ছেলে, সেও তেমনি এক ছেলে।

এদিকে হরলাল বাবুর সাহেবিয়ানা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই স্বার্থপরতাও বাড়িয়াছে। পোষ্যবর্গের মধ্যে নিজেকে লইয়া তাঁহার সংসারে চারি জন লোক মাত্র। তবু বিলাসিতার কেন্দ্র কলিকাতা হইতে বহুদূরবর্ত্তী কোচবিহারের মত স্থানেও তাঁহার মাসিক সাড়ে তিন শত টাকা আয়ে কুলায় না। ছোট একখানি ফিটন গাড়ী, একটা ঘোড়া, সহিস, বয়, খানসামা, নূতন নূতন সাহেবি পোষাক ও স্ত্রীর গহনায় তিনি দেনদার হইয়া পড়িয়াছেন। বাবু 'সাহেব' হইলেও স্ত্রী বিবি সাজিতে না পারায় গহনায় ব্যয়াধিক্য দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ের গহনার লোভ সম্বরণ করা বড় সহজ কথা নহে। আর, সাড়ে তিন শত টাকায় ফ্যামিলি লইয়া কোন 'সাহেব-বাবু'রই চলে না। কাজেই হরলাল মামীমাকে প্রথম প্রথম পনের টাকা মাসহরা দিলেও এখন বার টাকার বেশী পাঠাইতে পারে না। বিশেষ, মণি খাঁ তাহার কঠিন পীড়ার পর হইতে বেতন লয় না। অতএব স্বর্ণময়ীর মাসে বার টাকায়ই চলা উচিত। অবশ্য, মণি খাঁর খোরাকি হরলাল বাবু ধর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করেন নাই।

পর বৎসর স্বর্ণময়ীর মাসহরা আট টাকায় দাঁড়াইল। কারণ, হরলাল বাবুর বড় টানাটানি, নিজেরই খরচ চলে না। তিনি 'সরি' হইয়া স্বর্ণময়ীকে জানাইলেন, "একটা অকর্ম্মণ্য লোককে খামখা বসাইয়া রাখিয়া দুবেলা খাইতে দেওয়া অনাবশ্যক। তার চেয়ে গোপালের মাকে মাসে আট আনা দিলেই সে আপনার কাছে রাত্রে থাকিতে পারে।

এরূপ বন্দোবস্ত করিলে আপনার আট টাকায় স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। আমি নিজের খরচই কুলাইয়া উঠিতে পারি না, বাড়ীতে মাসে আট টাকার বেশী দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।”

পত্র পড়িয়া স্বর্ণময়ী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। এই তাঁহার আদরে পালিত হরলাল? স্বামীবর্ত্তমানে সংসারে স্বচ্ছলতা ছিল, স্বর্ণময়ী সঞ্চয়ের ভাবনা কখন ভাবেন নাই। বৈধব্যের পর হাতে নগদ যাহা কিছু পাইয়াছিলেন তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন খোকা বড় হইয়া স্কুলে পড়িতেছে, তিনটি লোকের খাইখরচ, কাপড়চোপড়, আট টাকায় কেমন করিয়া চলে? হরলাল একটুকু ভাবিয়া দেখিল না? যাক্, সে স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া সুখে থাক্, বেঁচে থাক্! উহার খরচপত্র বাড়িয়া গিয়াছে, কি করিবে? সে সুখে আছে জানিলেই তাঁহার সুখ। ভগবান্ তাঁহাদের দিনগুলি এক ভাবে চালাইয়া দিবেন। ব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা যাঁহার মাথায়, তিনি কি আর অনাথ অনাথিনীদের উপায় দেখিবেন না? দুঃখিনী অঞ্চল দিয়া নয়নের জল মুছিয়া ফেলিলেন।

স্বর্ণময়ী স্থির করিলেন, যোগীনের (খোকার) ও তাঁহার যেভাবে চলিবে, মণি খাঁরও সেইরূপে চলিবে। না হয়, প্রায়োপবেশন বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটিবে। এ ছেলেকে তিনি কি বলিয়া বিদায় দিবেন?

মণি খাঁ চিঠি শুনিয়া বলিল, “মা, আমার জন্য কিছু ভেব না। আমি ছেলেবেলা থেকে যে লাঠি ধরেছি তারই জোরে হেসে খেলে দুপয়সা রোজগার করব। মানকার চরে মজুমদার বাবুদের সঙ্গে চৌধুরী বাবুদের খুব লড়াই বেধেছে, দাঙ্গা চলেছে। আমাকে চৌধুরী মশায় তলব করেছেন। কাল ভোরে চরে যাব।”

স্বর্ণময়ী বলিলেন, "মণি, তুই যাস্ নে। ওসব মাথা ফাটাফাটি, রক্তারক্তির ভিতর তোকে যেতে দেব না।"

মণি। বল্‌চ কি, মা? সংসারে অনাটন, এত বড় ছেলে ঘরে ব'সে,—তা'কে দু'টাকা কামাতে দেবে না? তা' হবে না, মা। আর, এই লড়াইয়ে তোমার মণি যদি ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে,—লোকে হাসবে,—বল্‌বে, মণি খাঁর কব্‌জিতে জোর নাই। এ দুঃখ যে মলেও যাবে না, মা! তবু যদি নিতান্তই যেতে বারণ কর, তবে আমি নিজের মাথা নিজেই ফাটাব।

মণি খাঁর ঔষধ ধরিল। স্বর্ণময়ী এবার বলিলেন, "আচ্ছা, তবে যা। কিন্তু সাম্‌লে চলিস্, দেখিস্ বাবা, কোন বিপদ না হয়!"

মণি চলিয়া গেল। লাঠিয়ালি করিয়া সে শীঘ্রই চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে বক্‌সিস লইয়া ফিরিয়া আসিল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারে লড়াই শীঘ্র থামে না। পুনরায় মণি খাঁর তলব হইল। সে এবারেও ভাল রকম রোজগার করিয়া বাড়ী ফিরিল।

মণি কহিল, "দেখ্‌লে মা, গরীবের বোঝা খোদা ব'য়ে দেয়। মান্‌কার চরে গোল বাধায় আমাদের দু'মুঠা খা'বার যোগাড় হয়েছে।"

চৌধুরী মহাশয় লাঠিয়ালদিগের মুখে মণি খাঁর প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে মোটা বেতনে আপনার অধীনে চাকরি লইতে বলিলেন। সে কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "কর্ত্তা, চাকরির লোভ দেখাবেন না। হাজার টাকা দিলেও আমি নিমকহারামি কর্‌তে পার্‌ব না, মাকে ছেড়ে কোথাও থাক্‌ব না! তবে প্রয়োজন হয়, জানাবেন, শুনিবামাত্র লাঠি নিয়ে আস্‌ব, দু'টাকা কামিয়ে যাব।"

চৌধুরী। এভাবে ক'দিন চল্‌বে ?

মণি। যতদিন চলে।

মণি খাঁ লাঠির জোরে এই ভাবে কিছুদিন রোজগার করিতে লাগিল। ভাল লাঠিয়াল বলিয়া তাহার পূর্ব্ব হইতেই নাম ছিল। ঘটনাপরম্পরায় সে নাম আরও বাড়িল। ইহার পর আজ এখানে, কাল ওখানে লাঠি চালাইয়া সে কিছু সঞ্চয় করিয়া ফেলিল। এখন তাহার রোজগারে স্বর্ণময়ীর ও যোগীনের খরচপত্র চলে। হরলাল বাবু গত বৎসর হইতে দুই মাস তিন মাস অন্তর মাসহরা পাঠাইয়া উহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ, উপাধির লোভে বিলাতের ভূকম্পনে দুই হাজার টাকা চাঁদা দিয়া ও ঐরূপ আরো কয়েকটি বিষয়ে অর্থসাহায্য করিয়া তিনি সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত হইয়াছেন। মামীমাকে কিরূপে সাহায্য করিবেন ? যাহা হউক, হরলাল ভদ্রলোক, স্বর্ণময়ীর স্নেহের ঋণ হইতে সহজেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন, কিন্তু চাষা মণি খাঁ তাহা আদৌ পারিল না। সে তো তাঁহার মত বি, এ পাশ করিয়া ভাগ্যবলে বড়লোক বা 'সাহেব বাবু' হয় নাই, চাষার ছেলে চাষাই আছে। এই চাষা মণি খাঁই স্বর্ণময়ী ও যোগীনের এখন একমাত্র ভরসা ও অবলম্বন।

এদিকে স্বর্ণময়ী দিবারাত্রি সংসারের কাজ করিয়া সময় পাইলেই তুলা পেঁজা ও পৈতা কাটায় মন দিতেন বা রামায়ণ, মহাভারত পড়িতেন ; আজকালকার মত, অসার কবিতা বা গল্প-উপন্যাস যাহা সাময়িক ছাঁচে লিখিত ও বিশেষত্ববর্জ্জিত বলিয়াই আদৃত, সে সব পড়িয়া বা পরচর্চ্চা করিয়া সময় নষ্ট করিতেন না।

যোগীন ভাল ছেলে। সে বরাবর বৃত্তি পাইয়া ক্রমে এম্, এ পর্য্যন্ত

মাধোদাস।

মাধবচন্দ্র দাসের পিতা পিতামহ পশ্চিমে বসবাস করিয়া স্বভাবে ও ব্যবহারে অনেকটা 'পশ্চিমা' হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে 'স-টীক' বাব্‌রীকাটা চুল, মাথায় টুপী, চোখে সুর্মা, পরিধানে আজানু বস্ত্র ও রঙ্গীন মিরজাই, পায়ে নাগ্‌রা,—মাধব দাস ওরফে 'মাধো দাস'কে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। বিদ্যালয়ের তাঁবেদারি তাহার বেশীদিন ভাল লাগিল না। ভাল ছেলে বলিয়া ক্রমাগত একশ্রেণীতে বহু বৎসর রাখিবার জন্য শিক্ষকদিগের ষড়যন্ত্র, সে নাম কাটাইয়া, ব্যর্থ করিয়া দিল। স্কুলে প্রোমোশন না মিলিলেও সে সতীর্থ লালা বৃজমোহন, আবুল হোসেন প্রভৃতির সংস্পর্শে খৈনী হইতে তামাকু, তামাকু হইতে ভাঙ্গ্, ভাঙ্গ্ হইতে গঞ্জিকা, গঞ্জিকা হইতে তাড়ি, তাড়ি হইতে ধান্যেশ্বরী ও বিলাতি সুরায় চট্‌পট্ প্রোমোশন পাইল এবং কুলোকে তাহার গৃহপার্শ্বস্থা প্রতিবেশিনী পিয়ারীর সহিত তাহার আসক্তির অপবাদ রটাইল। আত্মীয় স্বজনেরা শুনিয়া বলিতেন, 'জোয়ানি বয়সে' এসব দোষ সকলেরই হইয়া থাকে। অবশেষে লাট্টু, গুলিডাণ্ডা, কবুতরের লড়াই, ঘুড্ডি প্রভৃতি ছাড়িয়া সে ক্রমে জুয়াখেলা আরম্ভ করিয়া দিল। কিছু "ক্ষেতি" ছিল,—তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। ইহার পর অল্প স্বল্প তেজারতির বলে 'মাধোদাস' বন্ধুবান্ধবের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ আবদার করিয়া তাহাকে 'মাধোয়া' বলিয়া

ডাকিত। 'মাধো' ছাড়া ইয়ারদের আসর জমে না। ক্রমে সে একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের সর্দ্দার হইয়া উঠিল।

এতগুলি গুণ যাহার তাহার পরিণয়কার্য্য সমাধার জন্য আত্মীয়স্বজন বিহিত কালের পূর্ব্বেই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বিশেষ, মস্তিষ্ক উষর হইলেও মাধবের কলেবর ভোজপুরীর মত বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছিল। যথাসময়ে জনৈক দীর্ঘপ্রবাসী বাঙ্গালী বদনচাঁদ ঘোষের কন্যা সুখবতীয়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দেশীয় প্রথানুসারে বাটীর ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা একটি ঢোলের সহিত তাল মান লয়ের পরওয়া না করিয়া প্রাণ ভরিয়া গান গায়িলেন, মধ্যে মধ্যে হুকা দেবী অন্দর মহাল হইতে উপযুক্ত সঙ্গতের কাজ চালাইলেন ও 'বরাতে' অপূর্ব্ব বাদ্যোদ্যমের সহিত 'দাই'দিগের বিচিত্র সুরের বিচিত্র গীত লোকের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল।

দুপয়সা উপার্জ্জন করাই এখন মাধো দাসের জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। শ্বশুর জেলাবোর্ডের ওভারসিয়ার। সুতরাং ছোট খাট ঠিকাদারি পাইবার অসুবিধা ছিল না, বিল পাশ হইবারও ভাবনা ছিল না। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, আবেদন নিবেদন, আশা ভরসা তাহার নিকট রুদ্ধদ্বার দুর্গের মত রহিয়া গেল। দেশে যাহারা ইংরেজি জানে না তাহারা বাঙ্গালা সাপ্তাহিকও পড়িয়া থাকে,—মাধো উহার কোনই আবশ্যকতা স্বীকার করিত না। যাহা হউক, তাহার উদ্দেশ্য শীঘ্রই সিদ্ধ হইল। সে অল্প-দিনেই দুপয়সা জমাইয়া ফেলিল।

তবে এঞ্জিনিয়ার সাহেবের সম্মুখে সে আট হাত ধুতি পরিয়া, ছেঁড়া

স্নেহের ঋণ

ও

অন্যান্য গল্প।

হেমাঙ্গিনীর অদৃষ্ট।

১

হেমাঙ্গিনী বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরে পড়িয়াছিলেন। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে উল্লাসে আনন্দে, পতিপ্রেমস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু সুখ কাহারও মৌরসি সম্পত্তি নয়। হেমাঙ্গিনীর নারীজন্মের আশা মাতৃত্বে সার্থকতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পতিবিয়োগ হইল।

যে ক্ষণিক বিরহব্যথা কোন দিন সহিতে পারিত না সে কিরূপে আজ পতির সহিত চিরবিচ্ছেদ সহিবে? অভাগিনীর শোক অশ্রুজলে বহির্মুখী হইতে না পারিয়া অন্তর্মুখী হইল,—হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনীর সহচরীসঙ্গ আর ভাল লাগে না। তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী চিন্তা। প্রেম-অভিমান, হাসি-কৌতুক, স্নেহ-আদর মূলক কত ক্ষুদ্র কথা, কত তুচ্ছ ঘটনা তিনি চিন্তার ফুৎকারে উজ্জ্বল করিয়া দেখিতেন। তাহাতে কত সুখ, কত আনন্দ পাইতেন। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষতে শান্তির প্রলেপ দিতে যে ধন্বন্তরি

সে কোথায়? চিন্তায়, শোকে রোগের উৎপত্তি। হেমাঙ্গিনী শয্যা গ্রহণ করিলেন।

বসন্তের শুক্লা সপ্তমী। পার্শ্ববর্ত্তী ধনীর বাটীতে মার মহাপূজা। বরাবর যেমন এবারও তেমনি তাঁহার বাড়ীতে কীর্ত্তন হইতেছিল। করুণ পদাবলীর মধুর স্বরতরঙ্গ লুটিয়া লুটিয়া রুগ্নার কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিতেছিল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন,—

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর বহনা,
হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা।
কোকিলাকুল কুহ্বতি কল, অলিঝঙ্কার কুসুমে,
হরিলালসে প্রাণ তেজব, পাওব আর জনমে।"

প্রেমের ভাস্বরদীপ্তিবিচ্ছুরিত, শব্দালঙ্কার, ছন্দের ঝঙ্কার ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে অনুপ্রাণিত, আশার রক্তিমরাগে রঞ্জিত, ক্রন্দনের সুরে গাঁথা সেই মূর্ত্তিমতী প্রেমবিহ্বলতা সঙ্গীতাকারে তরঙ্গায়িত হইয়া হেমাঙ্গিনীর হৃদয়বেলায় আঘাত করিল। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, "হরিলালসে প্রাণ তেজব, পাওব আর জনমে।" মর্ম্মর হইতেও দৃঢ় সেই পতিবিরহিনীর ভক্তি, স্ফটিক হইতেও স্বচ্ছ তাঁহার বিশ্বাস, সিন্ধু হইতেও গভীর তাঁহার ভালবাসা, সাগরসঙ্গমলালসায় বেগবতী স্রোত-স্বতী হইতেও উদ্দাম তাঁহার হৃদয়াবেগ। তিনি আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিতে দিতে মনে মনে কহিলেন, "প্রিয়তমের সঙ্গে আমার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর হইতে কেন মুক্ত হইল না? তাঁহার সহিত অনন্তের পথে উধাও ভাবে কেন উড়িল না?" হেমাঙ্গিনী মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত নীলাকাশ, নিম্নে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত

স্নেহের ঋণ।

তিন মাসের ছেলে কোলে লইয়া স্বর্ণময়ী বিধবা হইলেন। স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল। এখন হরলাল ব্যতীত তাঁহার অন্নবস্ত্র যোগাইবার আর কেহ নাই। ননদের পুত্র হরলালকে তিনিই মানুষ করিয়াছেন, বি, এ পড়াইয়া বিবাহ দিয়াছেন। সে এখন কোচ-বিহারের মহারাজের ষ্টেটে জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী, বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে।

দারিদ্র্যের পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া হরলালের মেজাজ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার গর্ব্বস্ফীত চালচলন দেখিয়া তাহাকে এখন চেনা দায়। সে বড়লোকের সঙ্গে মিশিয়া 'সাহেব-বাবু' সাজিয়াছে, লম্বা চওড়া কথা কয়, দেশের ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের খবর রাখে না, মামীমার বাড়ীতে বড় আসে না। বাল্যসঙ্গীদের কেহ কেহ পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া চাকরির চেষ্টায় গ্রাম্যবেশে তাহার বাসায় উপস্থিত হইলে সে লজ্জাবোধ করে ও অনেককে চিনিতে পারে না; যাহাদের নিতান্ত চিনি না বলিলে চলে না, তাহাদিগকে আপাততঃ কোন কাজ খালি হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিদায় দেয়। এই ভাবে সে কোন রূপে আপনার নূতন মান লইয়া আছে। আমরাও মানীর মান বাঁচাইতে তাহাকে এখন হইতে 'আপনি'ই বলিব।

হরলাল বাবু কোচবিহারে সস্ত্রীক-সপুত্রকন্যা থাকেন। বাড়ীতে থাকেন

মামীমা। একটা ঠিকা ঝি সময়মত কাজ করিয়া চলিয়া যায়, দিবা রাত্রি থাকে মণি খাঁ।

মণি খাঁর বাপ পিতামহ স্বর্ণময়ীর শ্বশুরবাড়ীতে কাজ করিত। উত্তরাধিকারসূত্রে সেও সেই সংসারে খাটে। পিতৃবিয়োগের পর চাচাদের সহিত তাহার খুব বিবাদ-বিসংবাদ হয়। তাহার ফলে পরস্পর কথাবার্ত্তা ও মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর মণি খাঁর ভয়ানক আমরক্ত পীড়া হইলে চাচারা কেহ তাহাকে দেখিতে আসিল না। প্রথম হইতে অনিয়মে তাহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। তাহা জানিয়া স্বর্ণময়ী তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনাইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ও গ্রামে ভাল চিকিৎসক না থাকায় পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে প্রসিদ্ধ ডাক্তার কামাখ্যা চরণ বাবুকে পাল্কী করিয়া আনাইয়া তাহাকে দেখাইলেন। কৃতজ্ঞতায় মণির কোটরগত চক্ষুতে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু তাহা বাহির হইতে পারিল না। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মা, আমার জন্য আপনি এত কর্‌চেন কেন? চাচারা আপন হয়েও একবার দেখ্‌তে এল না। আর আপনি যমের সঙ্গে ল'ড়ে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌চেন! আমি এবার বাঁচ্‌ব না মা! আমার জন্য আর অনর্থক খরচপত্তর কর্‌বেন না।" স্বর্ণময়ী বলিলেন, "মরিবে কেন, বাছা? ডাক্তার বাবু বলেছেন তোমার আর প্রাণের আশঙ্কা নাই।"

ছোটলোকের 'রাজপুত্তুরের' মত সেবা দেখিয়া গ্রামের ভদ্র কৃষক সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া মণি খাঁ তাহার মা ঠাকুরুণকে ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল না। সেই হইতে সে স্বর্ণময়ীর কাছেই রহিয়া গেল, খায়

পাশ করিল ও তারপর 'কম্পিটিটিভ্' পরীক্ষায় ডেপুটি হইল। এখন তাহার বিবাহ হইয়াছে। স্বর্ণময়ীর ও মণি খাঁর হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। তাহাদের সুখশশী এতদিনে উদিত হইল।

কিন্তু এভাবে বেশী দিন কাটিল না। স্বর্ণময়ী পৌত্রের মুখ দেখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। যোগীন ও মণি খাঁ "হায়!" "হায়!" করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মণি তিন দিন তিন রাত্রি মা ঠাকুরুণের বিয়োগে অন্নজল স্পর্শ করিল না, শয্যা হইতে উঠিল না।

এখন তাহার বৃদ্ধাবস্থা, যোগীনের ছেলেই তাহার সর্ব্বস্ব। তাহাকে লইয়া সে কখনও ঘোড়া, হাতী বা এঞ্জিন হইয়া দিন কাটায়। বালকে বৃদ্ধে বড় ভাব। বিশেষ, বালকেরা ভালবাসা বা ভালবাসার অভাব বড় সহজে ধরিয়া ফেলে। মণি খাঁর কাছে অসীম আদর পাইয়া যোগীনের খোকা তাহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। মণিরও সেই অবস্থা। সে বলে, "আমি এখন যোগীনের খোকার বুড়া ঘোড়া, ব'সে ব'সে পেন্সিল খাচ্চি।"

সব ভাল, কিন্তু হাকিমের ঘরণী মৃণ্ময়ী লোক ভাল নন। কি জানি কেন তিনি এই বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখিতে পারিতেন না। স্বামীর উপর তাহার অপরিসীম প্রভাবেও তিনি তাহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। মণিদা যা'বলে যোগীন তাহাই করে, ভুলেও একবার তাহাকে কোন কাজ করিতে বলে না। "অকর্ম্মণ্য চাকর ব্যাটা জামাই আদরে আছে, কেবল ব'সে ব'সে বাবুর মত খাচ্চে" মৃণ্ময়ী স্বামীকে একদিন একথা বলিতেই যোগীন কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, "এমন কথা আর মুখে এনো না। মণিদার অন্নে আমি পালিত। এ পর্য্যন্ত তাহার স্নেহের

কোন প্রতিদান দিতে পারিনি। এত দিন বাঁচিয়া আছি যাহার পিতৃবৎ স্নেহে, তাহার নিন্দা শুনিলেও আমার পাপ।"

সেই হইতে মৃণ্ময়ী স্বামীকে মণি খাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না, কিন্তু বাক্যজ্বালায় তাহাকে দূর করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অদৃষ্ট এমনি, মণি কিছুতেই ডেপুটিগৃহিণীর রুষ্ট কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। বেশী কিছু বলিলে বলিত, "বৌমার গলা সদরালার বাড়ী পর্য্যন্ত শোনা যাচ্চে।"

একদিন মণি খাঁ খোকাকে লইয়া নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় মৃণ্ময়ী চটিয়া লাল হইয়াছেন। সে আসিবামাত্র মৃণ্ময়ী মিছামিছি বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি মণি খাঁকে অযথা নানা দুর্ব্বাক্য কহিয়া ঝিকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই বুড়ো নেড়ে ব্যাটাই খোকাকে একদিন মেরে ফেল্‌বে। ওকে এখনি বাড়ী ছেড়ে যেতে বল্‌।"

মণি রাগ করিয়া বলিল, "বৌমার যা বল্‌তে হয় আমাকে বল্লেই হয়, ঝিকে দিয়ে বলা কেন?"

মৃণ্ময়ী। মর্‌ মিন্সে কি বিড়বিড় ক'রে বক্‌ছে! ঝি, খোকাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আয়। রেগে আমার বাছার কোন অনিষ্ট কর্‌বে।

মণি আর সহিতে পারিল না। সে গর্জ্জিয়া কহিল, "কি?"

সে ইহার পর আর কিছু বলিতে পারিল না। ঝি খোকাকে লইয়া আসিল। মণি খাঁর চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু গণ্ড বহিয়া পড়িল। সে স্থিরদৃষ্টিতে একবার সেই বাড়ীর দিকে চাহিল, চাহিয়া নীরবে বাটীর

বাহির হইয়া গেল। সেই দৃষ্টি এত করুণ ও মর্ম্মভেদী যে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সে দৃষ্টি বিস্ময়, কাতরতা, ধিক্কার, শোক ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ভাষাময়! সে দৃষ্টি যেন বলিয়া গেল, "হায় নিষ্ঠুর, আমায় চিনিলে না? মা ঠাকুরুণ থাকিলে তিনি কি এই চির পুরাতন চাষাকে বুড়া বয়সে ত্যাগ করিতে পারিতেন? হায় নবীনা, তোমাদের হৃদয়ে কি স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা ছাড়া গরীবের উপর দয়া, পরোপকার ও উদারতার স্থান নাই? কি ক্ষোভ, কি লজ্জা!"

এজলাস হইতে আসিয়া যোগীন পোষাক ছাড়িয়া খাবার খাইতে বসিল। কেবল একটি পাত্রে জলখাবার আছে দেখিয়া বলিল, "মৃণ্ময়ি, মণিদার খাবার কোথায়?"

মৃ। সে রাগ ক'রে কোথায় চ'লে গেছে।

যো। অসম্ভব, মণিদা রাগ ক'রে আমায় ছেড়ে যেতে পারে না। সত্য বল, কি হয়েছে?

খোকা এমন সময় "দাদা গেল, কেঁদে চলে গেল" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মৃণ্ময়ী বলিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ঝিকে জিজ্ঞেস কর। তোমার মণিদা আমায় যথেষ্ট অপমান করে গেছে।"

যো। মিথ্যা কথা, মণিদা স্ত্রীলোকের অপমান কর্‌তে পারেনা,—তায় তোমার? সে এমন লোকই নয়, মৃণ্ময়ি! আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমিই আমার দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছ!

মৃণ্ময়ী প্রত্যুত্তরে কিছু বলিলেন না। যোগীন আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "শোন মৃণ্ময়ি, আমি নিমকহারাম নই। মণিদা যতক্ষণ অনাহারে থাক্‌বে ততক্ষণ আমি জলবিন্দু স্পর্শ কর্‌ব না।"

যোগীন মণি খাঁর অনুসন্ধানের জন্য একদিকে নিজে গেল, অন্যদিকে পাচক ও ভৃত্যকে পাঠাইল। কিন্তু তাহাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া যোগীন কাহারও সহিত কথা কহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, "যার জন্য আজ আমার এই মানসম্মান, সুখস্বচ্ছলতা, সে বিনা কিসের শান্তি, কিসের সুখ? মণিদাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। মণিদা, মনুষ্যত্বের অনাবিল ধারা যে কেবল শিক্ষিত ভদ্র-মণ্ডলীর বা উচ্চ গণ্ডীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় না, আমরা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করি ভারতবর্ষে তাহাদিগেরও মধ্যে উহার ফল্গু ধারা যে অনন্তকাল হইতে অব্যাহতভাবে বহিতেছে তাহা তুমিই শিখাইয়াছ, তুমিই দেখাইয়াছ! আর বুঝাইয়াছ, অনেক সময় তোমরা আমাদের চেয়ে কত বড়, কত উচ্চ!"

সেই রাত্রে সদরালার বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। ডাকাতেরা সহরের গুণ্ডা বদমাইসের দল। ডেপুটি যোগীন তাহাদের কালস্বরূপ ছিল বলিয়া উহারা তাহাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য তাহার বাটী আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারা লাঠি, মশাল, ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, বর্শা লইয়া পঁহুছিবা মাত্র কে সহসা ভীষণ হুঙ্কার দিতে দিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। যোগীন স্ত্রীকে বলিল, "মৃণ্ময়ি, তুমি দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছ? কিন্তু ঐ দেখ, মণিদা আমাদের বিপদের সময় মান অপমান ভুলে গিয়ে কোথা হ'তে ঝড়ের ন্যায় ছুটে এসেছে!" ইহা বলিয়াই সে "মণিদা! মণিদা!" বলিতে বলিতে লাঠি লইয়া ডাকাতদের উপর লাফাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে মণি খাঁর লাঠির প্রতাপ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা প্রমাদ গণিতেছিল। বৃদ্ধের কব্জির জোর ও হাকিম বাবুর

ওস্তাদি দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। গুরুশিষ্যের লাঠির আঘাতে দস্যুদের মধ্যে কাহারও তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল, কাহারও বর্ষা সড়কি হাত হইতে খসিয়া পড়িল, কাহারও মাথা গুঁড়া হইয়া গেল। ইহার মধ্যে মণি খাঁর হাঁকে পাড়ার অনেক সশস্ত্র বলিষ্ঠকায় যুবক সেখানে উপস্থিত হইল। দস্যুরা ক্রমাগত পিছু হটিতেছিল, এবার একেবারে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

যোগীন তখন "মণিদা! মণিদা!" বলিয়া মণি খাঁর গলা জড়াইয়া ধরিল। দাদার সঙ্গে দেখা হইলে সে তাহার উপর কত অভিমান করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। এখন বর্ত্তমান ঘটনাচক্রে সে সব ভুলিয়া গেল। কিন্তু কই, মণি খাঁ তো কোন উত্তর দিল না। যোগীন তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "মণিদা!"

দস্যুরা মণি খাঁর মাথায় যে বিষম তরবারির আঘাত করিয়াছিল তাহা হইতে দর দর ধারায় রক্তস্রোত বহিতেছিল। তাহা দেখিয়া যোগীন শিহরিয়া উঠিল। মণি খাঁ অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ভাই, একবার খোকাকে নিয়ে আয়। তোদের দুজনাকে দেখে মরি।" যোগীন ও তাহার খোকাকে দেখিতে দেখিতে মণি খাঁর প্রাণবায়ু অনন্তে মিলিয়া গেল। যোগীন বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মণি দা, তুমি মার স্নেহের ঋণ শোধ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলে! তোমার স্নেহের ঋণ শোধ করিতে আমায় অবসর দিলে না!—তুমি না মরিয়া যদি আজ আমি মরিতাম!"